সের্গেই বারুজদিন

রবি



ও



শশী



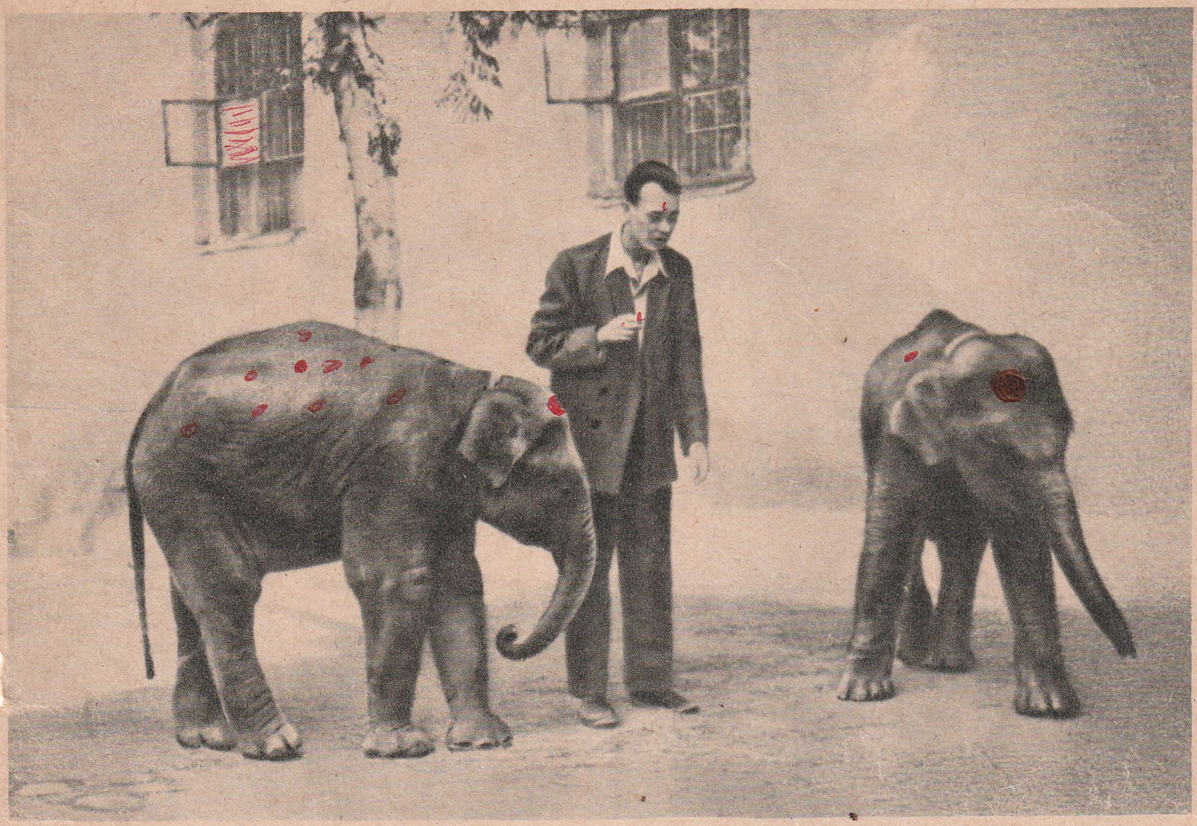
বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়

মস্কো

С. БАРУЗДИН

РАВИ И ШАШИ

অনুবাদ: সুনীল দাসগুপ্ত
সম্পাদনা: ননী ভৌমিক

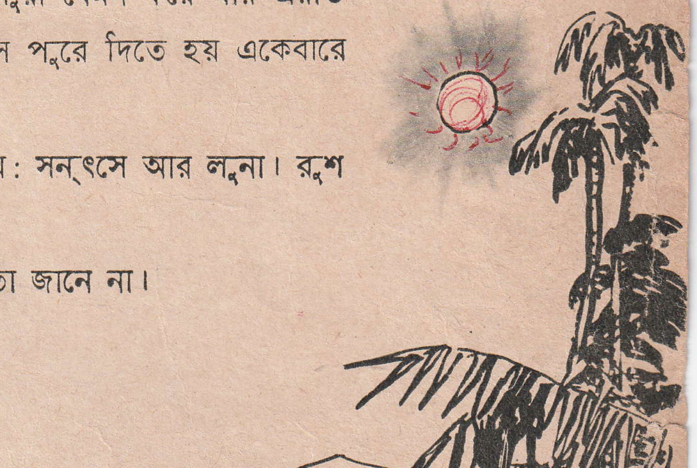




দুই বাচ্চা—রবি আর শশী। সব বাচ্চার মতো এরাও নানা রকম মজা করে, মাঝে মাঝে কাঁদেও। ছোট ছোট শিশুরা যেমন করে খায় এরাও খায় তেমনি করে। দুধ চিনি দেওয়া পায়স পুরে দিতে হয় একেবারে মুখের ভিতরে। নইলে খেতে পারে না।

রুশ ভাষায় তাদের নাম বললে সেটা শোনাবে এই রকম: সন্‌ৎসে আর লুনা। রুশ ভাষা বুঝলে রবি শশীরও তা জানা থাকত।

কিন্তু রুশ ভাষায় ওদের কী বলে ডাকে এখনো ওরা তা জানে না।



'সন্‌ৎসে, সন্‌ৎসে!' ছেলেমেয়েরা চিৎকার করে, রবি কিন্তু শুঁড়টা একটু দোলায় না পর্যন্ত।

'লুনা, লুনা!' বাচ্ছারা ডাকে শশীকে, কিন্তু তাদের দিকে ঘুরেও তাকায় না শশী।

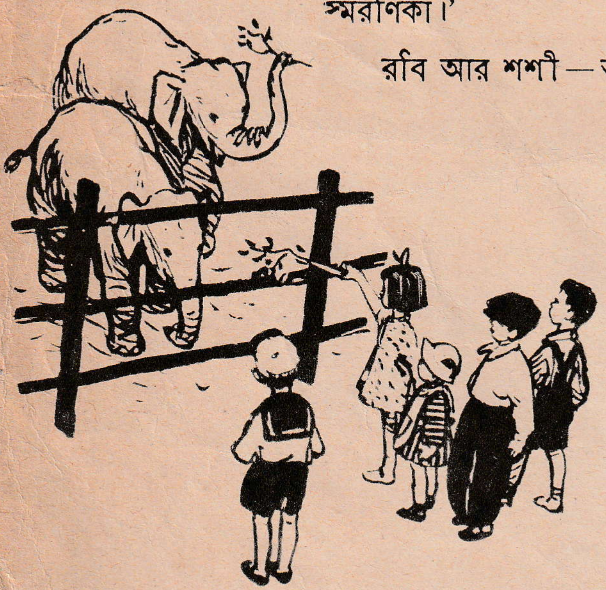
'বোধ হয় ওদের নাম গুলিয়ে ফেলেছি আমরা,' ছেলেমেয়েরা বলাবলি করে, 'দেখ না, ওরা কেমন এক রকম দেখতে।'

তা সত্যিই, রবি শশীর চেহারায় ভারি মিল। কিন্তু ভাই-বোন তারা নয়, এমন কি দূর সম্পর্কের আত্মীয়ও নয়।

রবি আর শশী—এরা ভারতবর্ষের শিশু হাতী। খুব অল্পদিন আগে আমাদের দেশে এসেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরু সোভিয়েতের শিশুদের জন্য উপহার পাঠিয়েছেন এদের।

শ্রীনেহেরু লিখেছেন, 'সোভিয়েত ইউনিয়নে পরিভ্রমণের সময় বহু ছেলেমেয়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল আর সর্বত্র তারা ভারতবর্ষের ছেলেমেয়েদের শুভেচ্ছা জানিয়েছে। এখন ভারতের শিশুদের তরফ থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের শিশুদের জন্য দুটি যৎকিঞ্চিৎ বৃহদাকার উপহার পাঠান হল—দুটি শিশু হাতী। যদিও ইতিমধ্যেই বেশ বড়োসড়ো দেখতে, তবু বয়স তাদের সবে মাত্র এক বছর। সোভিয়েত ইউনিয়নের শিশুদের কাছে যাচ্ছে ভারতের শিশুদের দূত হয়ে, সঙ্গে নিয়েছে শুভেচ্ছা ও বন্ধুত্বের বাণী... আশা করি, সোভিয়েত ইউনিয়নের ছেলেমেয়েরা ছোট্ট উপহার দুটির সঙ্গে মিতালি পাতাবে আর মনে রাখবে ভারতের ছেলেমেয়েদের, এই উপহার যাদের স্মরণিকা।'

রবি আর শশী—আমাদের ছোট্ট এই দুই বন্ধুকে নিয়েই আমাদের এই বইটি।





রবির জন্মভূমি

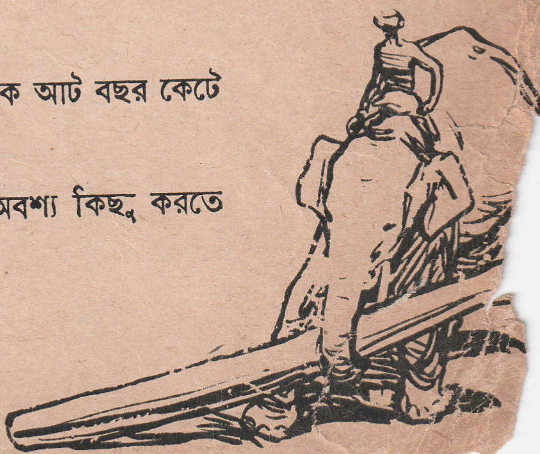
অনেক দূরের এক দেশ ভারতবর্ষ, তার দক্ষিণে অতি অপরূপ সুজলাসুফলা এক প্রদেশ, তার নাম মহীশূর।

এখানেই রবির জন্ম।

রবির মা খাটাখাটনি করে। নাম ললিতা।

জঙ্গলে ধরা পড়বার পর তাকে পোষ মানানো হয়। সেই সময় থেকে আট বছর কেটে গেছে। নানা রকমের কাজে ললিতা মানুষকে সাহায্য করে।

প্রতিদিন রবি মায়ের সঙ্গে কাজে যেত। নিজে নিজে কাজ সে অবশ্য কিছু করতে





পারত না। শুধু দেখত কী করে, কত সহজে অবলীলাক্রমে তার মা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে বড় বড় কাঠের বর্গা, তুলার গাঁইট, ভারি পাথর আর চালের বস্তা।

একদিন সকালে লরিতে আখের বাণ্ডিল বোঝাই দিচ্ছিল ললিতা। মা কি ভাবে মোটা মোটা বাণ্ডিলগুলি টেনে নিয়ে যাচ্ছে দেখতে দেখতে রবিও শুরু করল কাজ করতে। বাণ্ডিল থেকে এক গাছা আখ নিজের ছোট্ট শুঁড় দিয়ে টেনে বার করে নিয়ে এল সে। আখ গাছাটা ছিল খুব লম্বা, একটা দিক তার মাটির উপর গড়িয়েই চলল। তাতে কিন্তু হতাশ হল না রবি। টানতে টানতে লরির কাছে নিয়ে এসে, দিল সেটা মাকে। নিজেই যে আখ গাছাটাকে লরির উপরে তুলে দেবে সে ক্ষমতাটুকু তার তখনো হয়নি।

ফিরে এল রবি। সাহস আরো বেড়েছে। পুরো একটা আখের বাণ্ডিল শুঁড়ে জড়িয়ে ধরে টান মারল সে। একবার টানল, দুবার টানল—জায়গা ছেড়ে কিন্তু নড়ল না বাণ্ডিলটা। ফের টান মারল সে, আর হঠাৎ তার পা এমন টলে উঠল যে প্রায় মাটিতে পড়ে আর কি!

সব দেখতে পাচ্ছিল ললিতা। রবির কাছে এসে শুঁড় দিয়ে আদর করে এক পাশে সরিয়ে নিয়ে এল তাকে।

এত তাড়াতাড়ি নয় বাছা, কাজ শুরু করতে তোর এখনো কিছু দেরি আছে।

শশীর সঙ্গে পরিচয়

রবির স্বভাবটা একটু সাদাসিধে। কাজেই গলায় দড়ি বেঁধে তাকে কোথাও নিয়ে যাওয়া হলে সে বাধা দিল না, চিৎকারও জুড়ল না। অথবা লোকজনের মাঝখানে বাস করত বলে তার ভয়ডর ছিল না।

বাঙ্গালোর সহরে এল রবি। এখানে রেল-স্টেশনে তার জন্য দাঁড়িয়ে ছিল একটা মালগাড়ি।

মালগাড়িটার মেঝেতে ঘাস বিছিয়ে দেওয়া, তার মাঝখানে একটা খাড়া পার্টিশন।

কাঠের গ্যাং-ওয়ে দিয়ে মালগাড়ির ভিতরে উঠে এল রবি আর গিয়ে দাঁড়াল

পার্টিশনের বাঁ দিকটায়। সঙ্গে সঙ্গে কাজে লেগে গেল সে: ছোট্ট একটা ঘাসের গোছা শুঁড় দিয়ে মুখে পুরে দিল তারপর আর এক গোছা তুলে ছুঁড়ে দিল নিজের পিছন দিকে, তারপর এক গোছা মুখে পুরে আবার আরেক গোছা ছুঁড়ে দিল পিছন দিকে।

এই নিয়ে যখন সে ব্যস্ত তখন হঠাৎ শুনতে পেল কার যেন চিৎকার। চোখ পড়ল তার মালগাড়ির দোরের বাইরে, সেখানে দাঁড়িয়ে শশী। গোঁ ধরেছে সে, ভিতরে আসতে চায় না।

শশীর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারল না সে। আশ্চর্য ত, কেন অমন গোঁ ধরেছে ও আর কাঁদছে?

রবি অবশ্য জানত না যে মোটে অল্প কিছু দিন আগে কুর্গের জঙ্গলে ধরা পড়েছে শশী, মানুষের সঙ্গ এখনো তার গা-সহা হয়নি।

শেষ পর্যন্ত দুজন লোক এসে ত শশীকে ঠেলে নিয়ে ঢোকাল মালগাড়ির ভিতরে সেই পার্টিশনটার ডান দিকটায়।

মালগাড়ির ভিতরটা আধো-অন্ধকার, কিন্তু তাতে পাশের প্রতিবেশীর দিকে নিজের শুঁড়টা বাড়িয়ে দিতে রবির আটকাল না। ফুঁ দিল রবি, এমন কি ঘোঁৎ ঘোঁৎও করে উঠল। কিন্তু না, শশী মোটেই গা করলে না। কোণের দিকে সরে গিয়ে মাথা নামাল শুধু।

অবশেষে মালগাড়িটা আটকে দেওয়া হল ট্রেনের সঙ্গে।

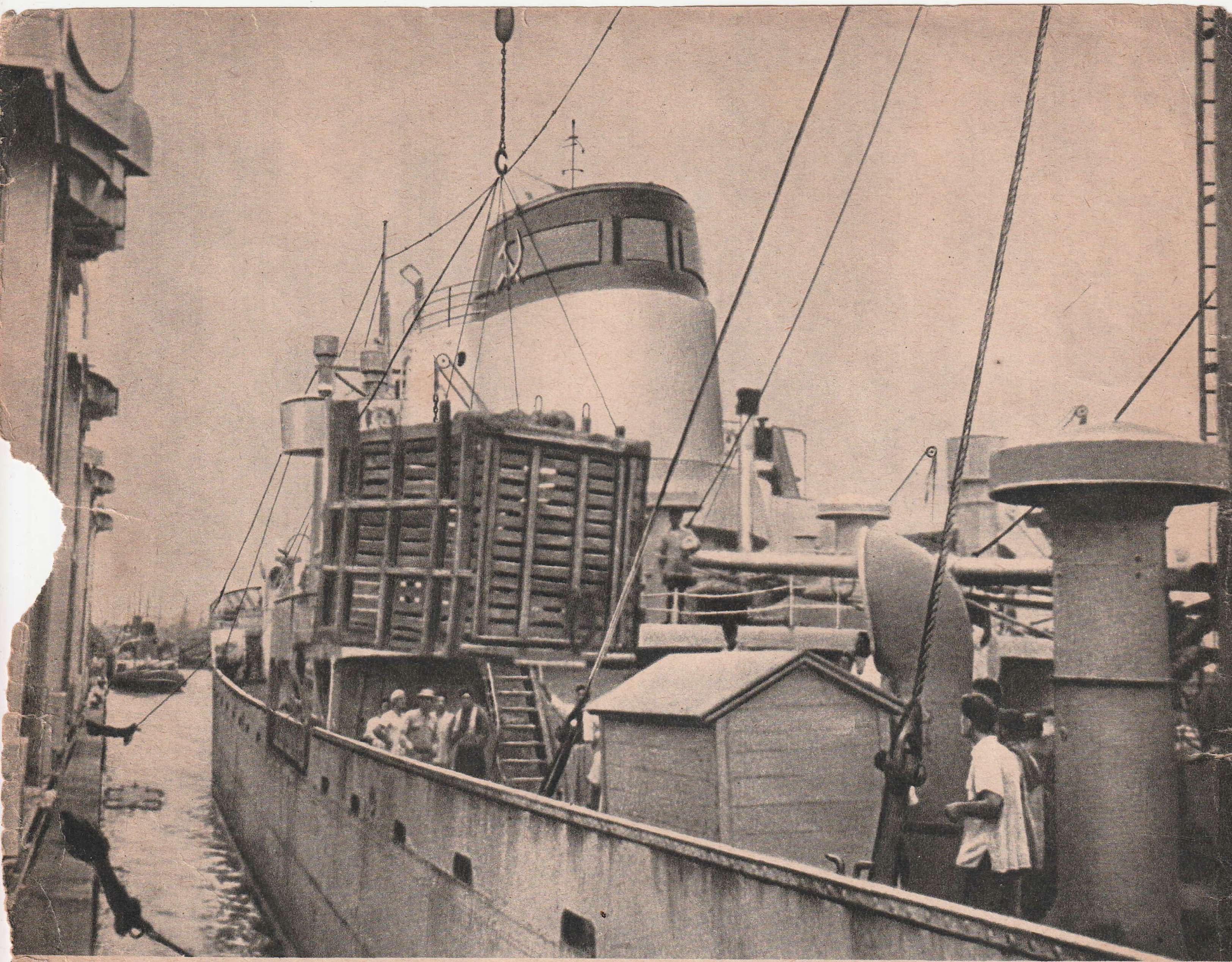
ড্রাইভার হুইস্‌ল দিলে গাড়ি চলতে শুরু করল।

একবার এ পায়ে ভর দিল শশী, আবার অন্য পায়ে, তারপর ফিরল পার্টিশনটার দিকে। গাড়ি চলছে, সেই চলন্ত গাড়ির সঙ্গে তাল রেখে এই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকাই যেন অনেক বেশি আরামের মনে হল তার।

ওদিকে তার দিকটায় দাঁড়িয়ে ছটফট করছিল রবি, সেও চলে এল পার্টিশনটার কাছে।

এই ভাবেই হল তাদের পরিচয়।



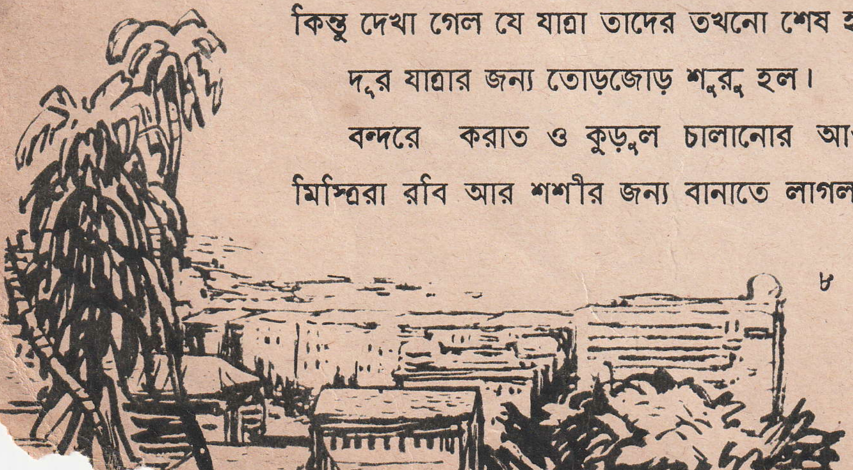


দূর যাত্রার আগে

দ্বিতীয় দিনে রবি আর শশী এসে পেঁছিল মস্ত সহর বোম্বাইতে। সমুদ্রের বন্দর পর্যন্ত নিয়ে আসা হল তাদের মালগাড়িটাকে, তারপর তাকে রাখা হল সাইডিং-এ। এটা কিন্তু দেখা গেল যে যাত্রা তাদের তখনো শেষ হয়নি।

দূর যাত্রার জন্য তোড়জোড় শুরু হল।

বন্দরে করাত ও কুড়ুল চালানোর আওয়াজ শোনা গেল। জয়নার ও ছুতোর মিস্ত্রিরা রবি আর শশীর জন্য বানাতে লাগল বিশেষ খাঁচা। বাচ্চা হাতীদের জন্য এই



খাঁচাগুলি হওয়া চাই বেশ আরামদায়ক, প্রশস্ত আর টেকসই। সেজন্য ওগুলো তৈরী করতে হবে সাধারণ তক্তা থেকে নয়, বানাতে হবে ভারতের সবচেয়ে কঠিন যে কাঠ সেই 'লোহা কাঠ' থেকে।



দর্জির দোকানে সেলাই-কল চলতে শুরু করল। দর্জিরা সেলাই করলে রবি আর শশীর জন্য বিশেষ সাজ। হাতীদের সাজপোষাকগুলো হওয়া চাই সুন্দর, স্বাচ্ছন্দ্যকর আর অবশ্যই বেশ গরম। তাই সবচেয়ে গরম উলের কাপড় থেকে এগুলো সেলাই করল দর্জিরা।

লরির ভেঁপু শোনা গেল বন্দরে। ড্রাইভাররা জেটিতে নিয়ে এল চাল আর চিনি, আখ আর দুধ, আনারস আর পিসটাসিও, কলাগাছ, সবুজ ঘাস আর শুকনো খড়। দূরের যাত্রায় রবি শশী যেন থাকে পরমানন্দে, স্বাস্থ্য রক্ষা করে, খেতে যেন পায় যত খুসী সবচেয়ে সুস্বাদু আর মুখরোচক খাবার!

জাহাজে ওঠা

তোড়জোড় যা কিছু সব শেষ হল। সেই সময় বোম্বাই বন্দরের জেটিতে এসে নোঙ্গর গাড়ল সোভিয়েত জাহাজ 'স্তাভরপল'।

'বোঝাই শুরু করা যাক,' বলে উঠলেন ক্যাপ্টেন চেরনব্রোভকিন।

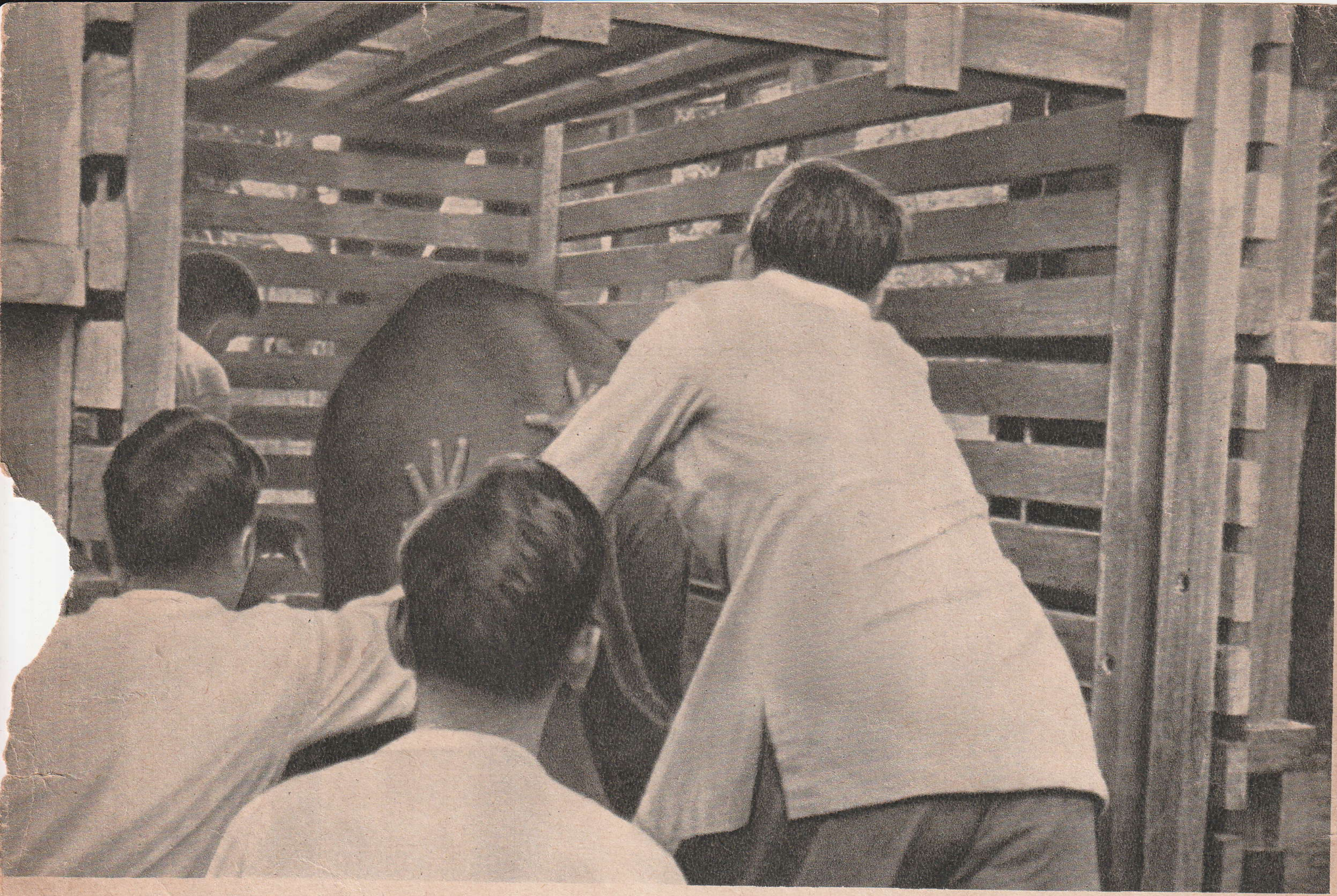
জাহাজের কাছে এল দুটো ট্রাক, তাতে আছে ট্রেইলার। এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে যে খাঁচাটা তার মধ্যে রবি আর দু নম্বরেরটাতে শশী।

মস্ত এক ক্রেন তার দাঁড় বাড়াল এক নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে। রবি যাতে ভয় না পায় সেজন্য খাঁচাটা ঢাকা দেওয়া তেরপল দিয়ে, তা আবার লোহার দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা।

রবি কিন্তু ভয় পায়নি। ক্রেনটা যেই লোহার দড়ি ধরে টান দিল অমনি প্রথমে সামনের পা দুটো, তারপরে পিছনের পা দুটো গুটিয়ে এক জায়গায় করে রবি শুয়ে পড়ল নরম খড় বিছানো খাঁচার মেঝের উপর।

খাঁচাটা একটু দুলে উঠল, তারপর উঠে গেল প্ল্যাটফর্ম থেকে। ধীরে ধীরে জেটির



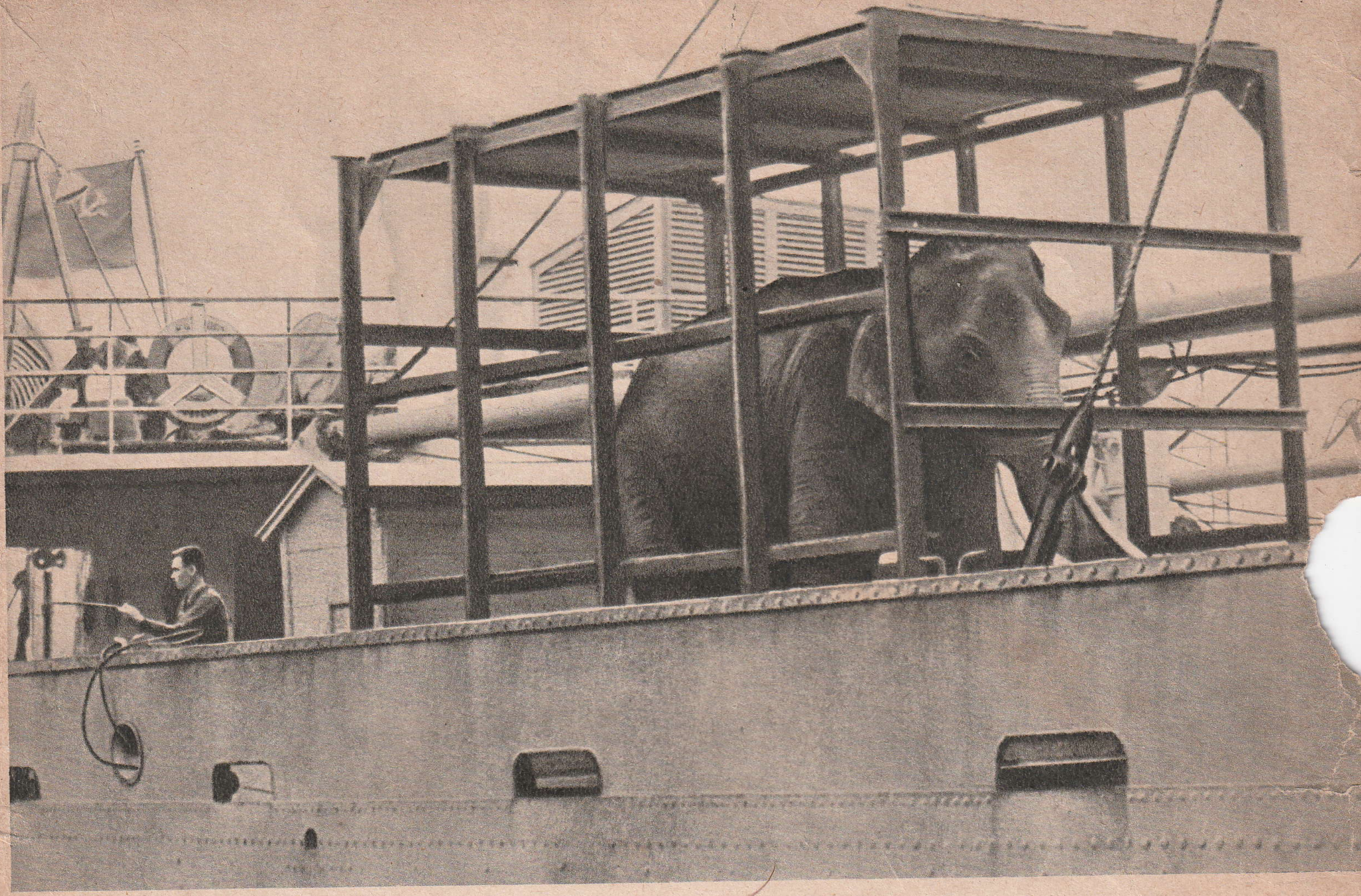


উপর দিয়ে শূন্যে ভেসে জাহাজের দিকে চলল রবি। তারপর কিছু বুঝতে না বুঝতেই জাহাজের পিছন-ডেকের উপরে এসে হাজির।

এবার শশীর পালা।

ক্রেন তার খাঁচাটা হুকে আটকাল। শুয়ে পড়বার বদলে এক কোণ থেকে আরেক কোণে ছোটাছুটি করতে লাগল শশী, তীক্ষ্ণ উচ্চ স্বরে আর্ত চিৎকার করে উঠল।

হঠাৎ তার কানে এল শিঙ্গার আওয়াজ। আওয়াজটা এসেছিল ডেক থেকে— কিন্তু না তো, জাহাজের সিটিও নয়, চুঙ্গীর ভোঁও নয়, এ যে খুব পরিচিত কারুর, অনেকবার শোনা গলার ডাক এটা। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় চুপ করে গেল শশী আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই এসে পড়ল জাহাজের উপরে।



কে ডাকলে জাহাজে

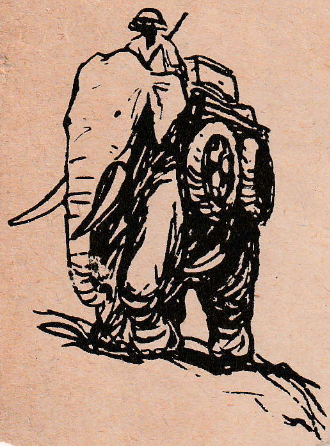
বাচ্চা হাতীসমেত খাঁচাগুলি রাখা হল পিছনের ডেকের বাঁ দিকে।

নাবিকেরা খাঁচা-ঢাকা তেরপলগুলো সরাতে রবি আর শশী একবার বাঁ দিকে তাকায়, একবার ডান দিকে তাকায়। দেখে জাহাজে প্রতিবেশীও আছে। নাম তাদের 'বাক জাপ' আর 'ভৈ কাই লন'। তারা ছিল বড়ো বড়ো লোহার খাঁচায় পিছনের ডেকের উল্টো দিকে, বাচ্চা হাতীদের দিকে শুঁড় উঁচাল ওরা।

'দেখেছ ত তোমরা একা নও এখানে,' বাচ্চা হাতীদের বললেন ক্যাপ্টেন চেরনব্রোভকিন।

'বাক জাপ' আর 'ভৈ কাই লন' ভিয়েটনামী হাতী। আর এদের নামগুলোকে যদি





রুশ ভাষায় অনুবাদ করা যায় তাহলে 'বাক জাপ'-এর মানে হবে 'সাদা থাবা' আর 'ভৈ কাই লন' হল 'বড় মাদী হাতী'। মোটেই বেশি দিন আগের কথা নয়, তাদের মাতৃভূমিতে, ভিয়েটনামে যুদ্ধ চলছিল। জনগণ লড়ছিল তাদের দুশমনদের সঙ্গে। বাক জাপ আর ভৈ কাই লনও তাতে লড়েছে। দিনের পর দিন রাতের পর রাত জলাজমি আর অগম্য বন-বাদাড়ের মধ্য দিয়ে যুদ্ধরত গণ ফৌজের সৈনিকদের কাছে তারা এনে দিত গুলিগোলা, সাজসরঞ্জাম আর রসদ।

'সহযোদ্ধা বন্ধু আমাদের,' আদর করে তাদের ডাকত ভিয়েটনামের অফিসার আর সৈনিকরা।

'সহযোদ্ধা বন্ধু আমাদের,' যে ভিয়েটনামীরা তাদের সঙ্গে এসেছিল তারা এই নামেই ডাকত ওদের। অল্পদিন আগেও এই ভিয়েটনামীরা ছিল গণ ফৌজের সৈনিক।

অবশ্য এত সব জানা ছিল না রবি শশীর। এটাও জানত না যে 'স্তাভরপল' জাহাজে করেই বাক জাপ আর ভৈ কাই লন যাচ্ছে ভিয়েটনাম থেকে সোভিয়েত জনগণের কাছে উপহার হিসাবে। কিন্তু এই বড় হাতীদের সহযাত্রী পেয়ে খুসী হয়ে উঠল রবি আর শশী। জাহাজে ওঠার সময় এদের গলার আওয়াজই তাহলে শুনেছিল শশী। বাচ্চা হাতীদের জন্য আশংকা হয়েছিল বড়োদের আর সেইজন্যেই ডেকে উঠেছিল তারা।

শুভ যাত্রা!

সন্ধ্যা পর্যন্ত সবকিছু তৈরী হয়ে গেল: ডেকের উপরে রবি শশীর খাঁচা দুটোকে আরো পোক্ত করে তোলা হল আর জাহাজের খোলের মধ্যে জমা করা হল তাদের যতো খাবার।

'দুটি বাচ্চা হাতীর জন্য এত লোক এসেছে বলে রাগ করবেন না যেন,' ক্যাপ্টেনকে বললেন ডাঃ সর্দার খাঁ। এক ভারতীয় চিড়িয়াখানার প্রধান তত্ত্বাবধায়ক তিনি।

'স্তাভরপল' জাহাজে তাঁর সঙ্গেই বসেছিলেন পশুচিকিৎসক ডাঃ রাও আর কর্মী মহম্মদ কাশেম ও পীর পাশা, এরা মহীশূরের পশুসংরক্ষণী থেকে এসেছিল।

'আপনাকে যথেষ্ট কষ্ট দিয়েছে এরা ইতিমধ্যেই। এবার পথে এদের যা কিছু দেখাশোনা করা দরকার সব আমরা নিজেরা করব: খাওয়ান, স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখা, সবকিছু,' বললেন ডাঃ রাও। 'শ্রীনেহেরুর উপহার যাতে নিরাপদে সোভিয়েত শিশুদের কাছে গিয়ে পৌঁছয় তা তো দেখতে হবে।'

'স্তাভরপল' জাহাজ বোম্বাই বন্দর ছেড়ে যাবে। বহুলোক জমা হয়েছে জেটিতে।

যারা বিদায় জানাতে এসেছিল তারা চিৎকার করে বলল, 'যাত্রা শুভ হোক!'

'ধন্যবাদ!' সোভিয়েত জাহাজীরা জবাব দিল ভারতীয় বন্ধুদের।

'ধন্যবাদ! ধন্যবাদ! ধন্যবাদ!'কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করলেন ডাঃ খাঁ আর ডাঃ রাও, কাশেম আর পাশা।

সোভিয়েত জাহাজের ডেকে ভারতীয়রা প্রথম যে রুশ কথাটি শিখেছিল সেটা এইটেই।

ঐ সন্ধ্যায় জাহাজের লগ-বুকে এই খবরটি বেরুল:

'বোম্বাই। শুক্রবার, ৫ই অগষ্ট ১৯৫৫। দুটি বাচ্চা হাতী বোঝাই দেওয়া হয়েছে আর সেই সঙ্গে জাহাজে এসেছেন চারজন তত্ত্বাবধানকারী, তাদের গন্তব্যস্থল ওদেসা বন্দর।'

ভাসমান চিড়িয়াখানা

আগে 'স্তাভরপল' ছিল এক সাধারণ জাহাজ, আর এখন হয়েছে যেন এক খাঁটি চিড়িয়াখানা। সব চিড়িয়াখানাতেই যে হাতী দেখতে পাওয়া যাবে তা নয়, অথচ 'স্তাভরপলে' আছে চার চারটে হাতী—দুটো বড়ো আর দুটো ছোট।

শুধুই যে বাক জাপ আর ভৈ কাই লন, রবি আর শশীই তাতে যাচ্ছে তা নয়।





আরো ছোট ছোট যাত্রীও আছে: ইয়াশ্‌কা, বোর্‌কা, জোর্‌কা আর মাশ্‌কা। এই নামেই এই চারটে ছোট মজাদার বাঁদরকে ডাকত জাহাজীরা। জাহাজের কর্তৃপক্ষ এদেরও উপহার পেয়েছেন ভিয়েটনাম থেকে।

ভারি দুষ্টুমি করে বেড়াত বাঁদরগুলি। ওগুলোকে নিয়ে কম কষ্ট পেতে হত না।



ইয়াশ্‌কাই ছিল সবচাইতে পাজী। ডেকে দৌড়চ্ছে ত দৌড়চ্ছে, তারপর লাফিয়ে ঢুকবে কারো কেবিনের ভিতর। ঢুকলেই কিন্তু সাবধান! বই পেলেই সেটা ছিঁড়বে; পেন্সিল পেলেই সেটা ভাঙবে; আর চশমা নাকের ওপর থেকে যদি ছিনিয়ে নেয় তাহলে সেটাকে গুঁড়ো গুঁড়ো না করা পর্যন্ত তার তৃপ্তি নেই।

প্রতিটি কেবিনে ইয়াশ্‌কা ঠিক গিয়ে বসবেই হাত মুখ ধোয়ার বেসিনে। ইতিমধ্যেই





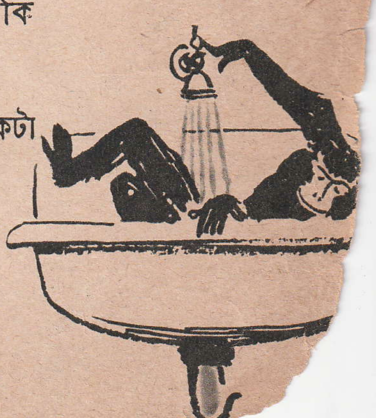




ওর স্বভাবের পরিচয় পেয়ে গিয়েছিল জাহাজীরা— বেসিন তারা জলে ভর্তি করে রেখে দিত, যাতে মনের সুখে স্নান করতে পারে ইয়াশ্‌কা।

একবার কিন্তু তাকে নিয়ে বিপদ হল। বড্ড বেশি দুষ্টুমি করতে করতে পিছলে গিয়ে ইয়াশ্‌কা পড়ে গেল জলে। আর সত্যি বলতে কি, খোলা সমুদ্রে সে-স্নান তার সাঙ্গ হত শোচনীয়ভাবে যদি ডেকের উপর থেকে ছুঁড়ে দেওয়া জাহাজীদের দড়িটা সে ধরে ফেলতে না পারত।

ইয়াশ্‌কার জন্য বিশেষ করে ভুগত বুফে-কর্মী গালিনা ভ্লাদিমিরভনা। যেই সে টেবিল সাজাত অমনি এসে হাজির হত ইয়াশ্‌কা: প্লেট থেকে একটা ডিম, কি মিষ্টি, কি স্যাণ্ডউইচ চুরি করে নিয়ে পালাত।



কোনো এক দিনে বড্ড বেশি বাঁদরামি করতে লাগল ইয়াশ্‌কা: পাউডারের একটা



বাক্স নিজের উপর ঢেলে দিয়ে গালিনা ভ্ল্যাদিমিরভনার লিপ-স্টিক কেড়ে নিয়ে সেটা দিয়ে কেবিনের সারা দেওয়ালে আঁকিবুকি কেটে বেড়াল।

রবি আর শশী কিন্তু বাঁদরটার এই সব দুষ্টুমি দেখতে পেত না। ইয়াশ্‌কা, বোর্‌কা, জোর্‌কা আর মাশ্‌কা সবাই সমান ভয় খেত হাতীদের সে বড়োই হোক, আর ছোটোই হোক। হাতীদের ডেকে বেড়াবার সময়টা তারা দৌড়োদৌড়ি করত হাতীদের খাঁচা থেকে অনেক দূরে সামনের ডেকে।

অবিশ্যি শুধু যে হাতীদেরই তারা ভয় পেত তা নয়। শিপুন বা সুভিস্তকে দেখাবামাত্র বিদ্যুতের বেগে যেন উড়ে গিয়ে উঠে বসত একদম মাস্তুলের চূড়ায় আর ভয়ের বস্তুটি যতক্ষণ না সরানো হত ততক্ষণ কিছুতেই নামত না।

শিপুন আর সুভিস্ত হল বোয়া সাপ। এরাও এসেছে ভিয়েটনাম থেকে। বোয়ারা দুর্দান্ত সাপ কিন্তু জাহাজীদের কেউ এদের ভয় পেত না। শিপুন আর সুভিস্ত এখনো বাচ্চা, বড়ো হয়নি, লম্বায় হবে শুধু চার হাত, মানুষের কাছে বিপজ্জনকও নয়।

বড় হয়ে যখন আঠারো হাত কি কুড়ি হাত লম্বা হবে তখনকার কথা আলাদা।

যেদিন থেকে রবি আর শশী জাহাজে এল, সেদিন থেকে কিন্তু বোয়াদের জীবন বদলে গেল। শিপুন আর সুভিস্তকে ডেকের উপর আনা অবিলম্বে নিষেধ করে দিলেন ক্যাপ্টেন চেরনব্রোভকিন।

তিনি বললেন, 'খোকাখুকু ভয় পেতে পারে।'

রবি শশীকে ক্যাপ্টেন বলতেন, 'আমার খোকাখুকু'।

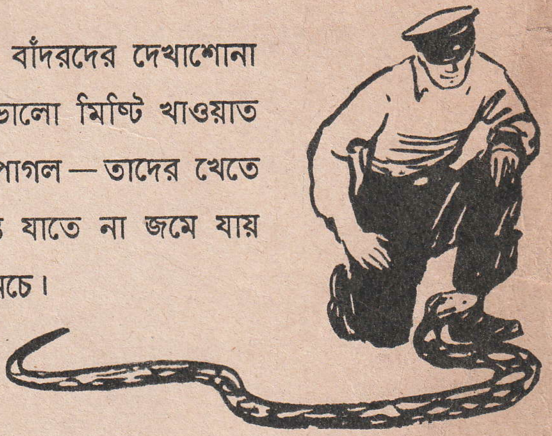




যার যাকে পছন্দ

ভাসমান চিড়িয়াখানায় দর্শক সংখ্যা প্রচুর। কাজ থেকে ছুটি পেলেই জাহাজীরা সবাই এসে হাজির হত জানোয়ারদের সঙ্গে সময় কাটাতে।

এক একজনের ছিল এক এক রকম রুচি। সারেঙ্গ সাভসাকিন বাঁদরদের দেখাশোনা করত, ভিয়েটনামী সঙ্গীদের সাথে মিলে বড়ো হাতীদের ভালো ভালো মিষ্টি খাওয়াত জাহাজী কর্লামিয়েৎস। মেকানিক শ্লীকভ বোয়া সাপদের নিয়ে পাগল — তাদের খেতে দিত সে, নিয়ে যেত নিজের কেবিনে, আর শিপুন আর স্ভিস্ত যাতে না জমে যায় অথবা ঠাণ্ডা না লাগে সেজন্যে তাদের রাখত ইলেকট্রিক আলোর নিচে।





কেবল মাত্র ক্যাপ্টেন চেরনব্রোভকিন হয় সব রকমের কাজে তাঁর দায়িত্ব আছে বলে অথবা কাকে তাঁর সবচেয়ে বেশি ভাল লাগে তা ঠিক করতে না পারায় জাহাজের এই অসাধারণ যাত্রীদের সবাইয়ের প্রতিই ছিল তাঁর সমান আগ্রহ।

কিন্তু অনেক দর্শকই বিশেষ করে আসত খাঁচার মধ্যে রবি আর শশীকে দেখতে।

'সবাই একসঙ্গে বাঁ দিকের ডেকে যাবেন না,' বলে উঠত তরুণ ইলেকট্রিশিয়ান সকলোভ, 'জাহাজ উল্টে যাবে কিন্তু।'

ঠাট্টা করত সকলোভ। রবি আর শশী সম্বন্ধে তারই উৎসাহ বোধ হয় সবচাইতে বেশি।

সকালের আলো ফুটতে না ফুটতেই সে গিয়ে হাজির হত শিশু হাতীদের খাঁচার কাছে।

'সুপ্রভাত! সুপ্রভাত!' বলত সকলোভ। মনে হত যেন শিশু হাতীরা ওকে চিনতে পেরেছে।

খাঁচা থেকে শুঁড় বার করত রবি, সেটা এখনো ভারি ছোটো আর সরু, সোজা বাড়িয়ে দিত উবু হয়ে বসা সকলোভের মুখের দিকে।

সকলোভ তার শুঁড়ের মধ্যে ফুঁ দিত জোরে জোরে, রবির সেটা খুব পছন্দ। নাক দিয়ে আওয়াজ করত সে, সামনের পা গুটিয়ে হাঁটুর ভর দিয়ে বসে পড়ত রবি।

'সাবাস, সাবাস বাচ্চা!' সদয় কণ্ঠে বলত সকলোভ সোজা শিশু হাতীর শুঁড় লক্ষ্য করে, আর নতুন বিচিত্র শব্দগুলি শুনে রবি আসত শান্ত হয়ে।

তারপর আরো সব জাহাজী আসত খাঁচাটার কাছে আর সবাই পর পর রবির শুঁড়ের মধ্যে জোরে ফুঁ দিত, কথা বলত তার সঙ্গে।

মনে হত কেউ তার সাথে কথা বললে শশীরও বেশ ভাল লাগত; শুঁড়ের মধ্যে ফুঁ দিতে কিন্তু দিল না সে: ভাবখানা যেন, বেশ ত রবি যখন এত ভালবাসে তখন ফুঁ-টা তার শুঁড়েই দেও না কেন, আমাকে নয়, ও ধরনের রসিকতা আমি ভালবাসি না।

শুঁড় গুটিয়ে নিত শশী, অসন্তুষ্ট হয়ে মাথা নাড়াত —রেগে গেছে সে।



হরদম যে শশী শুঁড় বের করত খাঁচা থেকে তা নয়। শুঁড়টা যদিও ছোট তাহলে কি হয়,কাঠের পাটার মাঝে আটকে যেত সেটা। পরিষ্কার দেখা যেত ভয় পেয়ে গেছে সে, ভাবছে শুঁড়টা বুঝি বা গেল একেবারে। কি হবে তাহলে—শুঁড় ছাড়া যে হাতী সে যে হাতীও নয়,—মেয়ে-হাতী ত নয়ই!



কিন্তু যখন কান দুটো তার চুলকে দিত সকলোভ তখন আর সে বাধা দিত না, গোল গোল চোখ দুটো তার তৃপ্তিতে চকচক করে উঠত।

রবি কিন্তু খুসী মতো খেলা করত আপন মনে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে খাঁচার মধ্যে ছোটাছুটি করে বেড়াত সে তারপর খুসী মিটলে কাত হয়ে শুয়ে পড়ে মুহূর্তের মধ্যে সে ঘুমিয়ে পড়ত।

রাতেই শুধু তার ঘুম নয়, ঘুম দিনের বেলাতেও। ঘুম ভাঙ্গলে শুঁড় উপরের দিকে উঁচু করে তুলে ধরে বড়ো বড়ো হাই তুলত, কৌতূহলে নজর করে দেখত ডান পাশে, সেখানে ছিল বাক জাপ আর ভৈ কাই লনের খাঁচা দুটো। হয়ত আধা-ঘুমের মধ্যে নিজের বাবা-মা বলেই ভাবত তাদের, হয়ত বা স্বপ্ন দেখত কত তাড়াতাড়ি বড়ো হয়ে হবে ওদেরই মত প্রকাণ্ড এক হাতী।

প্রাতরাশ আর মধ্যাহ্নভোজন

চারবার করে দিনে জাহাজীদের কেবিনে আর মস্ত খাবার-ঘরে টেবিল সাজানো হত। এখানে হত জাহাজীদের প্রাতরাশ আর মধ্যাহ্নভোজন, বিকালের চা আর নৈশাহার।

হাতীদের কিন্তু অত বারবার খেতে নেই। তাদের সময়ও আলাদা, খাবারও আলাদা।

সকাল নটায় ছিল রবি আর শশীর প্রাতরাশ, বিকেল পাঁচটায় মধ্যাহ্নভোজন। আর যদিও ওরা এখনো একেবারে ছোট্ট, তবু সারা দিনে প্রত্যেকে এতই খেত যে একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের পক্ষে তা খাওয়া সম্ভব নয়।

রোজ সকালে ডাঃ রাও তাঁর নোট-বই খুলতেন। তাতে লেখা: ‘শুকনো চাল—এক সের, চিনি—এক পোয়া, টাটকা দুধ—ওজনে আধ সের, লবণ—এক তোলা, খড়—







কুড়ি সের, আখ—চার গাছা, সবুজ ঘাস আর ডালপালা—যত খেতে পারে।’ এক একটি বাচ্চা হাতীর জন্যে সারা দিনে এত সমস্ত খাবার! আর বড়োদের জন্য—সে আরও বেশি। দেখছ ত খাওয়ার বহরটা!

ঘাস আর খড় রবি শশী খেত সহজেই: শুঁড় দিয়ে এক এক গোছা তুলে পুরে দিত সোজা মুখের ভিতর। আখ—তাও নিজেরাই খেত। সমান করে কাটা, খোসা ছাড়ানো আখের খণ্ডগুলো শুঁড় দিয়ে সোজা হাত থেকে নিয়ে নিপুণভাবে মুখের মধ্যে চালান

করে দিত, রসিয়ে রসিয়ে খেত, খেতে খেতে শব্দ করত। বাকী খাবারের বেলায় কিন্তু ব্যাপারটা ছিল কঠিন!

একবার, জাহাজে চড়বার আগেই এক বাটি ভাত রাখা হয়েছিল রবির সামনে। রবি শুঁড় নামাল বাটির মধ্যে, চারদিকে ঘোরাল ফেরাল, কিন্তু ভাত কিছুতেই তুলতে পারল না। অনেক কষ্টে মনে হল কিছুটা ভাত বুঝি সে তুলেছে, কিন্তু যেই তা মুখের মধ্যে দিতে গেছে অমনি সব ভাত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। খালি শুঁড়টা চাটতে গিয়ে অপমানে কেঁদে উঠল রবি।

শশীর সামনেও রাখা হয়েছিল এক বাটি ভাত। শুঁড় সে নামাল, কিন্তু ভাত মুখে তুলবার চেষ্টা পর্যন্ত করল না সে।

রবি আর শশীর জন্য নিয়ে আসা হল এক বাটি করে দুধ। দুধ বোধ হয় ওরা ফেরত দেবে না; দুধ যে ভালবাসে সব বাচ্চাই।

দুধের দিকে তাকিয়ে দেখল রবি শশী, কিন্তু হয়ত কি ধরনের তরল জিনিষ এটা না বুঝতে পেরে মুখ ফিরিয়ে নিল।

অদ্ভুত ত, কে ভেবেছিল তা! বোঝা গেল, যে এখনো ওরা এত ছোট যে নিজে নিজেও খেতে পারে না।

সাহায্য করতে হল আমাদের। ভাতের মধ্যে টাটকা দুধ ঢেলে, তাতে গুঁড়োদানা চিনি মিশিয়ে তৈরী হল আসল পায়স।

হাতে করে কিছুটা পায়স নিয়ে ছোট করে গুলি পাকাল মহম্মদ কাশেম যাতে ছড়িয়ে না পড়ে, তারপর রবির মুখে গুঁজে দিল। রবি সেটা চেখে দেখল — মিষ্টি মিষ্টি, বেশ খেতে। চিবিয়ে চিবিয়ে গিলে ফেলল সে। শুঁড় তুলে মুখ হাঁ করল রবি: 'দাও না আর একটু'।

খানিকটা পায়স নিল পীর পাশা, আরো শক্ত করে গুলি পাকাল যেন ছড়িয়ে না যায়, তারপর দিল শশীর মুখে। শশীও পায়সটা চিবিয়ে চিবিয়ে গিলে ফেলল। সেও শুঁড় তুলে মুখ হাঁ করল: 'আমাকেও দাও আর একটু।'

এই ভাবেই জাহাজে খাওয়ানো হত রবি আর শশীকে।





সামাল! সামাল!



আবহাওয়ার অবস্থা ভালো লাগছিল না জাহাজীদের। দক্ষিণের সমুদ্রে অগস্ট মাস হল ঝড়ের মাস, এই সময় সমুদ্রে ঝড় ওঠে, ঝড় তুফান ছোটে। বোম্বাই আসবার সময়ও জাহাজ তোলপাড় করেছিল, আবার বোম্বাই থেকে যাবার পথেও তোলপাড় শুরু হল।

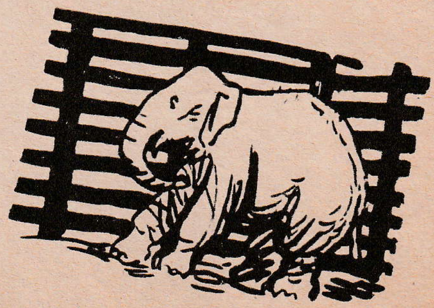
জাহাজের এই দুলুনিতে খুব খারাপ লাগল বড়ো হাতী দুটোর, আরো খারাপ লাগল রবি আর শশীর। খাঁচাগুলো তাদের তেরপলে ঢেকে দেওয়া হল, কিন্তু তাহলে কি হয়, সমুদ্রের জল ছিটে ছিটে পড়তে লাগল বাচ্চা হাতীদের গায়ে। সমুদ্রের জল লোনা, গায়ের চামড়া যতই মোটা হোক না কেন, লোনা জল লেগে লেগে নুনের জন্য চুলকানি যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল ওদের গায়ে।

ক্যাপ্টেন চেরনব্রোভকিন এই সব দেখে চেষ্টা করলেন হাওয়ার মুখোমুখি জাহাজ চালাতে। এতে ঢেউগুলি ডেকে না পড়ে জাহাজের নাকের উপর ভাঙে। ধারাল গলুইয়ে ঢেউগুলি কেটে কেটে গিয়ে ঢেউয়ের ঝাপটা চারপাশে ছড়িয়ে পড়তে লাগল—ডেকের ওপর আর পড়ল না।

কিন্তু এডেন উপসাগরে ঢুকবার মুখে, আরব সাগর আর ভারত মহাসাগরের সীমানায় জাহাজের ডেকের ওপর নামল প্রচণ্ড বৃষ্টি। সমুদ্র হয়ে উঠল আরো উত্তাল ও ফেনিল, বেড়ে গেল ঝড়ের গতি আগের চাইতে আরো বেশি। হঠাৎ প্রকাণ্ড এক ঢেউ আছড়ে পড়ল জাহাজের ওপর, বাঁ দিকের ডেকের উপর দিয়ে গড়িয়ে গেল সারা মেঝেয়। সেই মুহূর্তে শোনা গেল কাঠ ভাঙার মড়মড় শব্দ আর শশীর আর্ত চিৎকার। আপাদমস্তক ভিজে ঝুপঝুপে আতঙ্কিত শশী গিয়ে লুকোল এক কোণে, সেখান থেকে তাকিয়ে দেখল ঢেউয়ের তোড়ে তার খাঁচার ছোট্ট দরজাটা ভেঙে গেছে।

'সামাল! সামাল! সবাই ডেকের উপর।' শোনা গেল ক্যাপ্টেন চেরনব্রোভকিনের আদেশ।

ডেকের উপর দৌড়ে এল জাহাজীরা।



'যা কিছু ভাঙাচোরা এক্ষুণি মেরামত করে খাঁচাটা আরো পোক্ত করতে হবে!' আদেশ দিলেন ক্যাপ্টেন।

কাজ শুরু করে দিল জাহাজীরা।

এক ঘণ্টারো বেশি সময় ধরে ডেকে শোনা যেতে লাগল কুড়ুলের আওয়াজ, শোনা গেল শিকলের ঝনঝন। প্রাণপণে খাটল জাহাজীরা: খাড়া করে তুলল দুমড়ে মুচড়ে-যাওয়া শশীর খাঁচাটা, মেরামত করল ভাঙা দরজাটা। আর ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের মুশকিলে পড়তে না হয় সেজন্য দরজায় সাধারণ তালার বদলে লাগানো হল লোহার শিকল।



অসুখ কি করে সারল শশীর

সব ডাক্তারেরই আছে আপন আপন সরঞ্জাম, ডাক্তারী যন্ত্রপাতি। ডাঃ রাও-এরও তাই আছে। কিন্তু ডাঃ রাও তো আর সাধারণ ডাক্তার নন, যন্ত্রপাতিও তাঁর তেমনি অসাধারণ: দেখতে সব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড। ডাঃ রাও জন্তু জানোয়ারের চিকিৎসা করেন। রবি আর শশী তাঁর রোগী।

স্টেথিস্কোপের ভিতর দিয়ে বাচ্চা হাতীদের বুকের আওয়াজ শুনলেন ডাঃ রাও, থার্মোমিটার লাগালেন, পরীক্ষা করলেন ঠাণ্ডা লেগেছে কিনা, কাশি আছে কিনা। পথে উদ্বেগের অন্ত ছিল না ডাঃ রাও-এর। এখন তার সাথে এসে জুটেছে আর এক নতুন ঝামেলা: প্রচণ্ড দোলানিতে শশী অসুস্থ হয়েছে।

খাওয়া বন্ধ করল শশী। চার দিন, চার রাত ধরে শুয়ে রইল খাঁচার মধ্যে, প্রায় উঠল না: মাঝে মাঝে ঝিমোতে আর শুঁড় চুষতে লাগল।

যন্ত্রপাতি ভর্তি ডাক্তারী ব্যাগ থেকে ডাঃ রাও বের করলেন একটা বড়ো সিরিঞ্জ, সেটায় গ্লুকোজ ভরে গেলেন শশীর কাছে।

জীবনে এই প্রথম সিরিঞ্জ দেখল শশী, আর সব বাচ্চার মতই ভয় পেল। কিন্তু দেখা গেল, সুঁচের খোঁচাটা তেমন ভয়ানক নয়। চিৎকার করে উঠল শশী, ডাঃ রাও কিন্তু এদিকে কাজ সেরে সিরিঞ্জটা লুকিয়ে খাঁচা থেকে বেড়িয়ে এলেন। সন্ধেবেলায়,



দ্বিতীয়বার ইনজেক্সনের সময় আবার কেঁদে উঠল শশী, কিন্তু পরদিন সকালে শান্তভাবে দেখা করল ডাক্তারবাবুর সঙ্গে।

চোখগুলি তার খুসী খুসী। পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে হঠাৎ চাইল খাঁচার মেঝের দিকে, দুলছে না ত আর আগের মতো। সমুদ্রের দিকে তাকাল শশী — সমুদ্র প্রায় শান্ত, ডেকের মেঝের উপর জল ছিটোচ্ছে না। যাত্রাপথের দীর্ঘ দিনের মধ্যে এই প্রথম শশীর মাথার উপরে দেখা গেল সূর্যের আলোয় খুসী হয়ে ওঠা নীল আকাশ।

'স্তাভরপল' জাহাজ তখন চলেছে লোহিত সাগরের শান্ত জলের বুকের উপর দিয়ে।

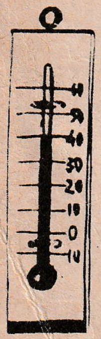
রবি শশীর শয়তানি

ঝড় নেই, হাওয়াও নেই লোহিত সাগরে। তার বদলে এল ৪০° ডিগ্রি গরম। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত দক্ষিণী সূর্য যেন জ্বলছে। ধাতুময় জাহাজের ডেকে পা পুড়ে যাচ্ছে যেন গরম কড়াই।

আবার তেরপলে ঢেকে রাখা হল রবি শশীর খাঁচা দুটো। হলে কি হয় সব সময় ওদের গরম লাগছে। শুঁড় বাড়িয়ে জল খেতে চাইছে।

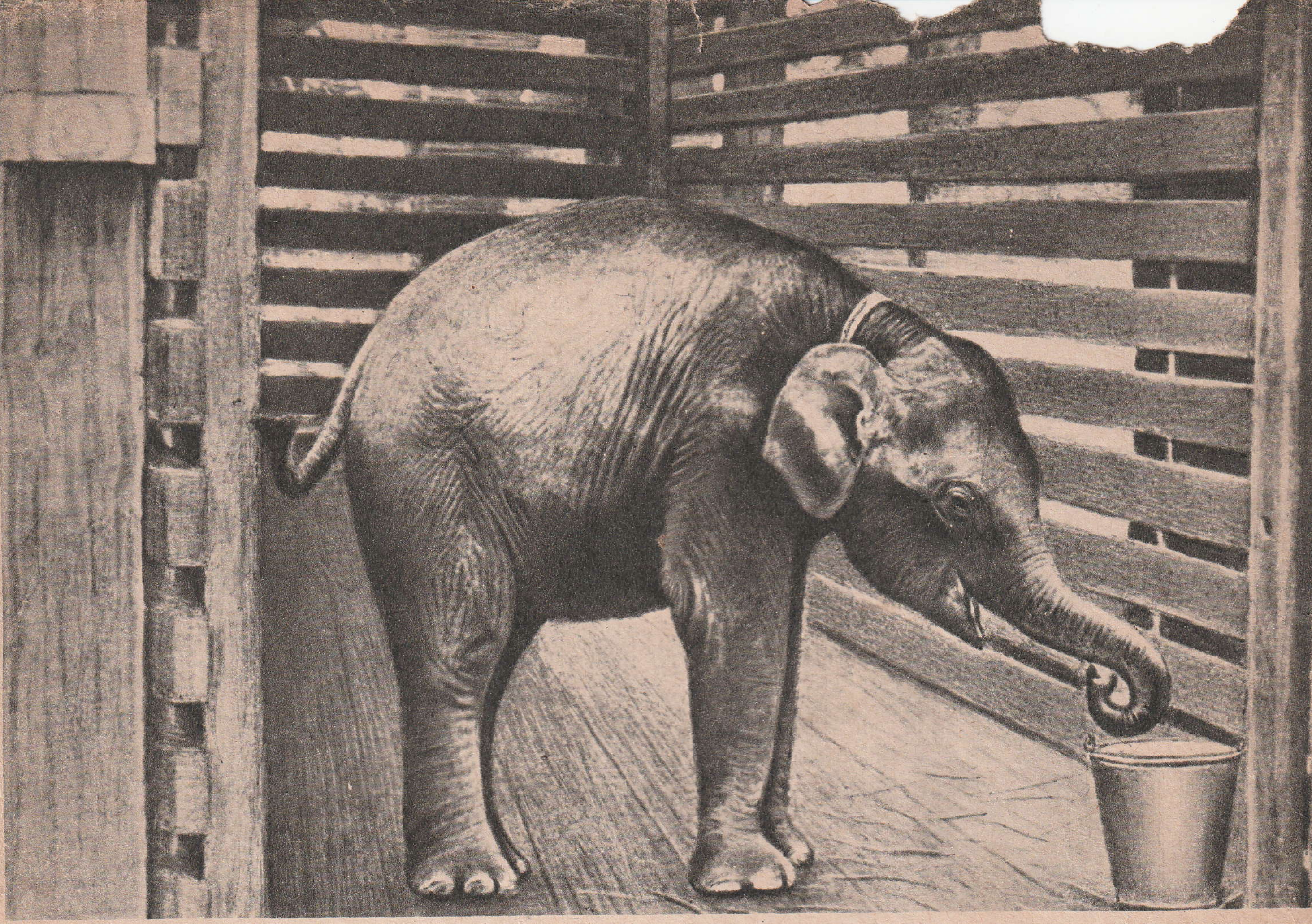
বাচ্চা হাতীরা নিজে নিজেই কারোর সাহায্য ছাড়াই জল খেত। রবি শুঁড় ডোবাত বালতির ভিতরে, সতর্কের মতো জল টেনে নিত যাতে একটি ফোঁটাও না পড়ে যায়, তারপর মুখে দিত। শশীর কিন্তু অতোটা সামর্থ্য হত না, জল তার ছড়িয়ে পড়ত, তবু নিজে নিজেই জল খেত সে।

পেট ভরে খেয়ে নিয়ে তারপর ওরা জল ছিটিয়ে দিত নিজেদের পিঠের উপর — সেই ওদের স্নান।



একদিন, দুদিন, তিনদিন ধরে চলল এই গরম। প্রচুর জল লোহিত সাগরে, কিন্তু সমুদ্রের সে লোনা জল ত আর খাওয়া যায় না। ট্যাঙ্কে জমান পানীয় জলের পরিমাণ এদিকে দিনের পর দিন কমে আসছে; অথচ পোর্ট-সৈয়দ এখনো দূরে। বোম্বাই ছাড়বার





পরে এই পথে জাহাজ প্রথম থামবে পোর্ট-সৈয়দে। তার আগে পানীয় জলের ট্যাঙ্ক ভর্তি করে নেবার সম্ভাবনা নেই।

‘রান্নাবান্না আর খাবার জল হিসাব করে খরচ কর,’ আদেশ দিলেন ক্যাপ্টেন।

তার মানে হল রবি শশীর পিঠের উপর জল ঢালা আর চলবে না, একটু ধৈর্য ধরতে হবে তাদের।

প্রাতরাশের পর মহম্মদ কাশেম আর পীর পাশা বাচ্চা হাতীদের জন্য জল নিয়ে এল আগের চেয়ে অর্ধেক। সবটা জল খেল রবি শশী, স্নানের জন্য মোটেই আর কিছু রইল না।

মধ্যাহ্নভোজের সময় এল, ভারতীয় পরিচারকরা পানের জন্য জল আনল আবার। কিন্তু রবি কেন জানি আগের মত জল খেল না। তার বদলে সমস্ত জল নিজের





পিঠের উপর ছিটিয়ে দিল। শশীও তাই করল। বালতি খালি করে ধূর্তের মত তারা শুঁড় বাড়িয়ে তাকাল মহম্মদ কাশেম আর পীর পাশার দিকে:

'আরো জল দাও আমাদের! আমরা খাব এখন!'

কিছু আর ছিল না পড়ে: খালি বালতিটা নিয়ে গিয়ে আবার জল আনতে গেল পরিচারকরা। বাচ্চা হাতীদের ত আর বিনা জলে রাখা চলে না!

'শয়তানি দেখেছ!' অবাক হয়ে বললেন ক্যাপ্টেন চেরনব্রোভকিন, 'ক্যাপ্টেনকে পর্যন্ত ঠকিয়েছে!'

এদিকে রবি শশী তখন নিজের নিজের শুঁড় নামিয়েছে নতুন ভর্তি-করা বালতির মধ্যে। জল ছিটনো ত হয়েছে, এইবার সাগ্রহে জল মুখে দিল তারা। হ্যাঁ, এখন খাওয়া যেতে পারে তাহলে!

রবির কী হল?

সুয়েজ খালের কাছাকাছি পেঁছিল জাহাজ, কিছু একটা গোলমাল ঘটেছে এখানে। সামনে দুটো বিদেশী জাহাজ হঠাৎ থেমে গিয়েছিল। বাধ্য হয়ে থামতে হল 'স্তাভরপলকেও'।

সুয়েজ খাল বেশি চওড়া নয়, বড়ো জাহাজের পক্ষে পাশ কাটিয়ে যাওয়া একেবারে অসম্ভব।

'স্তাভরপল' থামামাত্র তীব্র চিৎকার শোনা গেল ডেকে। চেঁচাচ্ছিল রবি। খাঁচার মধ্যে ছোটাছুটি লাগিয়েছে সে, শুঁড় বাড়িয়ে ধরছে একবার বাঁ দিকে, একবার ডান দিকে।

ভারতীয়রা দৌড়ে এল ডেকে। ডাঃ রাও খাঁচার মধ্যে ঢুকে বাচ্চা হাতীর কাছে গিয়ে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। রবি কিন্তু আর্তনাদ করতেই থাকল, যেন কেউ ওকে কাটছে।

এদিকে সামনে দাঁড়ানো জাহাজগুলো আর তাদের পিছন পিছন 'স্তাভরপল' আবার

এগোতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে রবি আর্তনাদ থামিয়ে যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাব করে শুরু করল খড় চিবোতে।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে জাহাজ আবার থামতে ব্যধ্য হল, আর ফের শুরু হয়ে গেল রবির চিৎকার।

'কি হয়েছে রবির? অসুখ হয়নি ত?' অস্থির হয়ে উঠলেন ডাঃ রাও।

'স্তাভরপল' যখন পোর্ট-সৈয়দ জেটিতে লঙ্গর করল তখন থেকে চেঁচাতে লাগল রবি। চেঁচাল এক নাগাড়ে কয়েক ঘণ্টা, করুণ সুরে কাঁদলে যেন কিসের সাহায্য চায় আর সঙ্গে সঙ্গে শুঁড় বাড়ালে তীরের মাটির দিকে।

পরে বোঝা গেল কেন কাঁদছিল রবি। জাহাজ যতবার থামে ততবার ও ভাবে যাত্রা শেষ হয়েছে, ততবার মাটিতে যেতে চেয়েছে ও। দীর্ঘ জলপথে ও ক্লান্ত হয়ে উঠেছিল।



ফের সামাল!

একদিন সকালে আবার শোনা গেল আদেশ:

'সামাল্, সবাই ডেকের উপরে!'

যাদের কাজ ছিল না সেই সব জাহাজীরা ছুটে এল কেবিন থেকে: অঘটন কিছু ঘটল নাকি আবার?

ভূমধ্যসাগর প্রশান্ত। কোন শব্দ নাই ডেকে। খাঁচাগুলি আছে জায়গা মতো, বাচ্চা হাতীরাও বেশ সুস্থ, সজীব। ব্যাপার কী তবে?

'আজ স্নানের দিন,' ব্যাখ্যা করে বললেন ক্যাপ্টেন চেরনব্রোভকিন, 'সব জানোয়ারদের আজ স্নান করাব আমরা।'

মস্ত গামলা আনা হল ডেকে, গরম জলে সেটা ভর্তি করা হল কানায় কানায়:

'আর কি, বানরেরা, এবারে ঝাঁপিয়ে পড় জলে!'

গামলায় প্রথম উঠল ইয়াশ্‌কা। ও যখন ঝুপ করে জলে নেমে ডুবাডুবি করতে লাগল, বাকী বানরেরা তখন বেশ নিরাপদ দূরত্ব রেখে বসে রইল, এমন কি জলের কাছে আসার চেষ্টা পর্যন্ত করল না।



সারেঙ্গ সাভসাকিনের উদয় হল। ইয়াশ্‌কার সামনের ঠ্যাং দুটো ধরে টানতে টানতে সে নিয়ে চলল ডেকের উপর দিয়ে:

'চান ত করেছ, যথেষ্ট হয়েছে!'

এই রকম মুহূর্তের জন্যই যেন অপেক্ষা করছিল বোর্‌কা, জোর্‌কা আর মাশ্‌কা। সঙ্গে সঙ্গে ছুটল তারা গামলাটার দিকে, ঝুপঝাপ ডুব দিল জলের মধ্যে।

ক্রুদ্ধ চিৎকার করে উঠল ইয়াশ্‌কা। কোনো রকমে সারেঙ্গের হাত ছাড়িয়ে দৌড়ে এল সে গামলাটার কাছে আর বেশি কিছু না ভেবেচিন্তে চুবাতে শুরু করল বানর ডুবুরীদের।

বাধ্য হয়ে আবার আসতে হল সারেঙ্গকে, ধরল ইয়াশ্‌কার ঠ্যাং দুটো তারপর হিঁর হিঁর করে টেনে নিয়ে গেল গামলা থেকে দূরে।

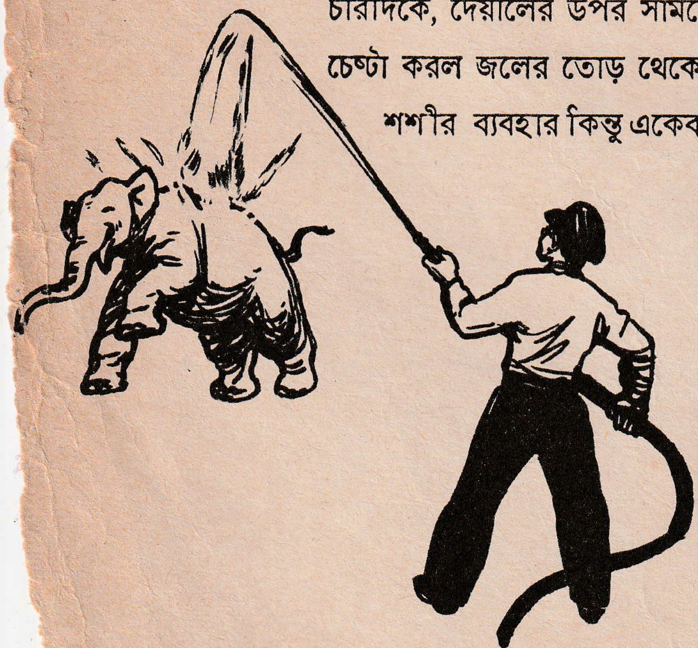
কাছাকাছিই স্নান করল বড় হাতীরা — বাক জাপ আর ভৈ কাই লন। তারা অবশ্য বানরদের মত ওরকম বাঁদরামি করেনি। বেশ একটা শান্ত মর্যাদার ভাব করে বাক জাপ আর ভৈ কাই লন জল ঢালছিল তাদের মস্ত মস্ত পিঠের উপর। জাহাজী কলমিয়েৎস আর ভিয়েটনামী তদারককারীরা তাদের খাঁচার কাছে জল-ভর্তি বালতি এনে এনে আর থই পাচ্ছিল না।

তার চাইতেও মজার ব্যাপার কিন্তু হচ্ছিল জাহাজের পেছনের বাঁ দিকটায়।

নিজেদের মনের মতো করে স্নান করছিল রবি শশী: ইলেকট্রিশিয়ান সকলোভ হোস পাইপ দিয়ে জল ঢালছে তাদের গায়ে।

জলে কেমন যেন একটু ভয় পেয়েছিল রবি। লাফাতে লাফাতে চেঁচাল খাঁচার চারদিকে, দেয়ালের উপর সামনের পা তুলে দাঁড়িয়ে উঠে, শুঁড় গুটিয়ে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করল জলের তোড় থেকে।

শশীর ব্যবহার কিন্তু একেবারে অন্য রকম: চিৎকার করল না, কোণে গিয়ে লুকোল না বা পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল না। এসব না করে বেশ শান্ত খুকীটির মতো একবার ডান পাশটা আর একবার বাঁ পাশটা এগিয়ে দিল জলের দিকে।



বেশ বোঝা গেল, স্নান করতে খুব ভালবাসে শশী!



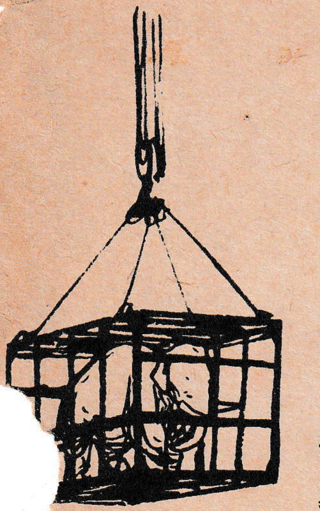
অবতরণের পালা

ষোল দিন ধরে জাহাজে চলেছে রবি শশী। তারপর 'স্তাভরপল' এসে পে'ৗছল ওদেসায়। তীরে নামতে হবে এবার।

বোম্বাইয়ের মতোই এখানেও জাহাজের ধারে খুব কাছে নিয়ে আসা হল একটা মস্ত উত্তোলক ক্রেন।

ডেকে ইতিমধ্যেই সব তৈরী হয়ে গিয়েছিল: বাক জাপ আর ভৈ কাই লনের খাঁচাগুলো আলগা করল জাহাজীরা, ভিয়েটনামী তদারককারীরা হাতীদের পিঠের উপর





জায়গা করে চড়ে বসল। এই রকম সময়ে এদের একা ছেড়ে দেওয়া চলে না—নামাবার সময় ভয়ডর পেতে পারে, পারে খাঁচা ভেঙে পড়তে, আর তাহলে ত সর্বনাশ!

সবার আগে জাহাজ ছাড়ল বাক জাপ। ক্রেন তার খাঁচাটা জেটিতে নিয়ে গেল। মনে হল সব ভালোই চলছে। শান্তভাবে সে দাঁড়িয়ে আছে খাঁচার মধ্যে, শুঁড়টা শুধু এপাশে ওপাশে একটু একটু দুলছে।

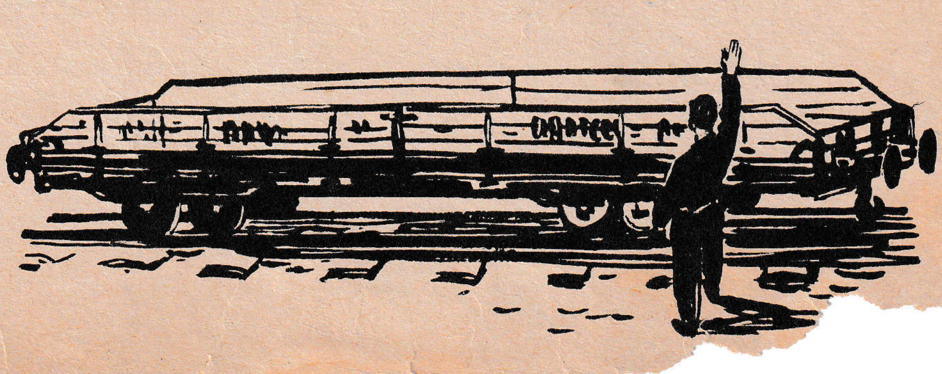
জেটিতে দাঁড়িয়ে আছে মালগাড়ি। ক্রেন ফিরল সেদিকে। চওড়া প্ল্যাটফর্মের ওপর খাঁচাটা নামাবার জন্য পুরোপুরি তৈরী হয়েছে ক্রেন-চালক, এখনি নামবে সেটা, এমনি সময় হঠাৎ খাঁচার মেঝে ভেঙ্গে বাইরে বেড়িয়ে পড়ল হাতীর সামনের ডান পা। তৎক্ষণাৎ মোটরের সুইচ বন্ধ করে দিল ক্রেন-চালক, আর প্ল্যাটফর্মের উপর শূন্যে ঝুলতে লাগল বাক জাপের খাঁচা।

কী করা যায় এখন? প্ল্যাটফর্মের উপর খাঁচাটা বসাতে গেলেই তো হাতীর পা পিষে যাবে; শূন্যে ঝুলিয়ে রাখাও বিপজ্জনক: ভয় পাওয়া হাতী হয়ত শেষ পর্যন্ত সমস্ত তলাটাই ভেঙে নিচে পড়ে গিয়ে জখম হয়ে বসবে।

কিন্তু ভিয়েটনামী তদারককারী যে হাতীর পিঠে বসে ছিল সে ত আর বিনা কারণে নয়: বাক জাপের ঘাড়ে হাত বুলিয়ে মাহুত আদর করে তাকে বলল পাটা একটু উঠাতে। ব্যাপারটা বুঝেই যেন বেরিয়ে-পড়া পাটা একটু তুলল বাক জাপ, আর এক মিনিটের মধ্যেই দেখা গেল খাঁচাশুদ্ধ রেলগাড়ীর প্ল্যাটফর্মের উপর নেমে এসেছে সে।

এবার পালা ভৈ কাই লনের। কী ঘটেছিল বাক জাপের বেলায় তা দেখে হস্তিনী ভাবল সে নিজেই যা করবার করবে। ক্রেনে করে যেই ও ডেক থেকে শূন্যে উঠে গেল অমনি সে শুঁড়টি বাড়িয়ে দিয়ে খাঁচার তলাটা আটকে ধরে রাখার চেষ্টা করল। ফলে হস্তিনীকে প্ল্যাটফর্মে নামাবার আগে কয়েক মিনিটের জন্য শূন্যে ঝুলিয়ে রাখতে হল নইলে চোট লাগবে শুঁড়ে। খাঁচার তলা থেকে শুঁড় সরাতে তাকে রাজী করাতে নিতান্ত কম বেগ পেতে হয়নি।

রবি শশী কিন্তু বেশ সাহস দেখাল। খালাসের ব্যাপারে তাদের নিয়ে কোনই বেগ পেতে হল না কাউকে। এত সহজেই জাহাজের ডেক থেকে বাচ্চা হাতীশুদ্ধ



খাঁচাগুলিকে তুলে নিয়ে এল ক্রেন যে মনে হল বুঝি ওগুলো শুধুই খালি কাঠের বাক্স।

জাহাজে বাকী রইল এখন বানর আর বোয়া সাপ। আরো একটা পাড়ি তাদের দিতে হবে এখনো: ওদেসা থেকে নভরসিইস্ক। নভরসিইস্ক থেকে যেতে হবে আরো দূরে স্তাভরপল সহরের পাইয়োনীয়ারদের কাছে, জাহাজীদের অনেক কালের বন্ধু এই পাইয়োনীয়াররা।



নতুন প্রতিবেশী

ওদেসা বন্দরে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল হাতীরা। মালগাড়ীতে করে দূরের এক সহরে চলে গেল ভিয়েটনামের হাতীরা—বাক জাপ আর ভৈ কাই লন।

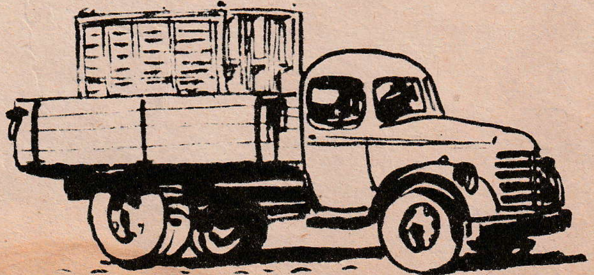
ভারতবর্ষের শিশু হাতীদের গন্তব্যটুকু অল্পই।

সহরের রাস্তা দিয়ে রবি শশীকে নিয়ে যাওয়া হল দুটো লরিতে করে; চিড়িয়াখানার গেটের ভিতরে ঢুকে লরি গিয়ে দাঁড়াল হাতীশালের সামনে।

'আরে এ যে একেবারে বাচ্চা!' অবাক হয়ে গেলেন চিড়িয়াখানার ডিরেক্টর খারিতোন খারিতোনভিচ, তারপর ... দ্রুত চলে গেলেন ক্রেন ডাকতে। বাচ্চা হলেও রবি শশী ত আর সাধারণ শিশু নয়, ওরা হল হস্তীশিশু। ক্রেন ছাড়া ওদের ত আর নামানো সম্ভব নয়!

বিশেষ গাড়ী এল ক্রেন নিয়ে, খাঁচাগুলো নামাল লরি থেকে।

লম্বা পাড়ির পর এই প্রথম রবি শশী দাঁড়াল মাটির উপর। অনিশ্চিতভাবে টলতে টলতে ওরা গিয়ে পেঁছল লোহার শিকের বেড়া দিয়ে ঘেরাও হাতীশালে আর এখানে দেখা গেল বেড়ার পেছনে আছে একটি বৃহৎ হস্তিনী।



‘আলাপ করো, এ হল আমাদের “দিল্লী”,’ খারিতোন খারিতোনভিচ বললেন রবি শশীকে, ‘এও এখনো বাচ্চাই, ওর বয়স মোটে দশ বছর।’

দিল্লীর দিকে তাকিয়ে দেখল ওরা: বাচ্চাই বটে! একটা গোটা বাড়ির মতো উঁচু আর ওজন বোধ হয় তিন টন।



সামনেই দুটো গাছে রবি শশীকে বেঁধে রাখা হল। দিল্লীর দিকে তারা শুঁড় বাড়িয়ে দিল। রবি এমন কি আরো বেশি করে কাছে যেতে চায়।

কিন্তু দেখা গেল, নবাগতদের সঙ্গে কোন রকম আলাপ করার কোন ইচ্ছাই নতুন প্রতিবেশীটির নাই। চটে গিয়ে সে ডাক ছাড়ল, তারপর শিকল ছাড়িয়ে তেড়ে গিয়ে বাচ্চা হাতীদের আঘাত করার চেষ্টা করল।

অগত্যা ক্রুদ্ধ দিল্লীকে বাচ্চাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল বেষ্টনীর বাঁ দিকের কোণে।

অপমানিত হয়ে বাচ্চা হাতী দুটি আর দিল্লীর দিকে তাকাল না। শশীর ঘাড়ের উপরেই নিজের শুঁড়টা তুলে দিল রবি, অল্প অল্প কালো কালো লোমের কুঁচিতে ভরা তার পিঠের উপর আদর করে শুঁড় বুলোতে লাগল।

নিঝুম দুপুর

দুপুরের নিয়মিত খাবার এল হাতীদের কাছে: সেদ্ধ ভাত, তাতে দুধ আর চিনি।

বাটি-ভরা ভাতের দিকে তাকিয়ে দেখল শশী তারপর মুখ ফিরিয়ে নিল: ‘চাই না আমি এসব!’

শশী বড়ো খামখেয়ালী।

রবি কিন্তু বাটি-ভরা ভাত দেখে শুঁড় তুলে মুখ হাঁ করল: ‘খাবার খেতে চাইব না, এত বোকা আমি নই।’

এক মুঠো খেল রবি, তারপর আরেক মুঠো, তারপর তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম... বাটি খালি হয়ে গেল!



শশী দেখল রবি যে শুধু তার নিজের ভাগটাই নয়, ওর ভাগের ভাতটাও দিব্যি খেয়ে নিয়েছে। আখের গাছ আনা হলে কিন্তু শশীই প্রথম শুঁড় দিয়ে মিষ্টি মিষ্টি আখের টুকরোগুলোকে তত্ত্বাবধায়কের হাত থেকে টেনে নিল।



খড়েও শশীর আপত্তি ছিল না। রবির মতো পিঠের উপর দিয়ে খড় ছুঁড়ে ছুঁড়ে সে দিত না বটে, কিন্তু এক মুঠো নিয়ে মুখে দাও ত দেখি—আজ্ঞে না! এ ব্যাপারে ওরা সমান, শশীর কাছে কোন খাতির নাই রবির।

দুপুরের খাওয়ার পরে—বিশ্রামের সময়।

এক ধারে গিয়ে রোদ নাই এমন একটা জায়গা বেছে শশী একপাশ হয়ে শুয়ে পড়ল। ঘণ্টাখানেক কি ঘণ্টাদুয়েক ঝিমিয়ে নিতে বেশ লাগে!

কিন্তু মনে হয় রবির সেটা পছন্দ নয়। শশীর কাছে গিয়ে পা গুটিয়ে একেবারে ধপ্, সোজা ওর গায়ের উপর পড়ে গেল রবি!

কি আর করা যায়, বাধ্য হয়ে উঠে দাঁড়ায় শশী। অসন্তুষ্ট হয়ে মাথা নেড়ে আরো দূরে গিয়ে আবার শোয়: 'দড়িটা ছোট, এখানে তুমি কি করে আমার নাগাল পাও দেখি!'

কথাটা সত্যি: রবি চেষ্টা করল কাছে যেতে, কিন্তু দড়িতে আটকে গেল। ওদিকে শান্ত হয়ে চোখ বুজল শশী।

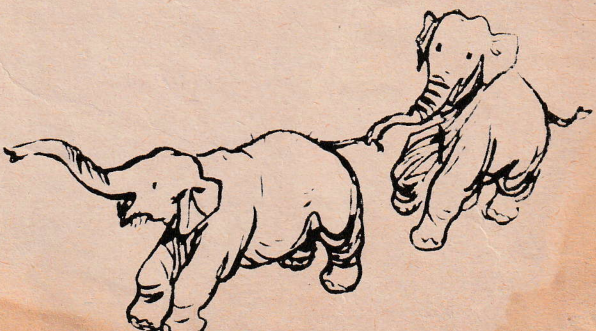
হঠাৎ—এ আবার কী? ওর ল্যাজটা ধরে কে আবার টানছে—একবার, দুবার, তিনবার!

চিৎকার করে লাফিয়ে উঠল শশী: 'কী লজ্জা!'

যা ভাবা গিয়েছিল—শুঁড়টি বাড়িয়ে ঠিক এসে ল্যাজটি চেপে ধরেছে রবি।

খোঁয়াড়ের অপর কোণে ঢুলছিল দিল্লী, শশীর চিৎকারে তন্দ্রা ছুটে গেল তার।

বিশ্রামের সময়ই বটে!



স্নানের ঘটা

বাচ্চা হাতীদের সঙ্গে তাদের সাজপোষাকও আনা হয়েছিল চিড়িয়াখানায়—গরম সাজপোষাক।

'হাওয়ার তাপ যদি ১৫ ডিগ্রির নিচে নামে,' ডাঃ রাও উপদেশ দিয়েছিলেন, 'তাহলে পোষাক পরিয়ে দিতে হবে। তা নাহলে রবি শশীর ঠাণ্ডা লাগবে। বাচ্চা হাতীদেরও সর্দিকাশি হয়।'

তবে এখনো পর্যন্ত সে পোষাকের দরকার হয়নি। ছায়ায় তাপ ৩০ ডিগ্রি, রোদে আরো বেশি।

চিড়িয়াখানায় হাতীদের স্নানের জন্য বিশেষ ধরনের জলাশয় ছিল না। রবারের একটা লম্বা হোস-পাইপ দিয়ে রাস্তায় জল দিত ঝাড়ুদার। সেই পাইপটা টেনে আনা হল খোঁয়াড়ের মধ্যে:

'চান করতে ইচ্ছুক এমন কেউ আছে কি?'

তা কেউ কেউ আছে বৈ কি।

বাচ্চা হাতীরা যাতে ভয় না পায় সেজন্য জলের তোড় প্রথমে ছাড়া হল আকাশের দিকে। ভাবটা এই যেন বৃষ্টি নেমেছে। সে বৃষ্টি ঝর ঝর করে পড়তে লাগল রবি শশীর গায়ে। বেষ্টনীর ভিতরে বাচ্চা হাতী দুটি ঘুরপাক শুরু করে দিল। কী করে বড় বড় ফোঁটাগুলির নিচে গিয়ে দাঁড়াতে পারে সেই হল ওদের চেষ্টা।

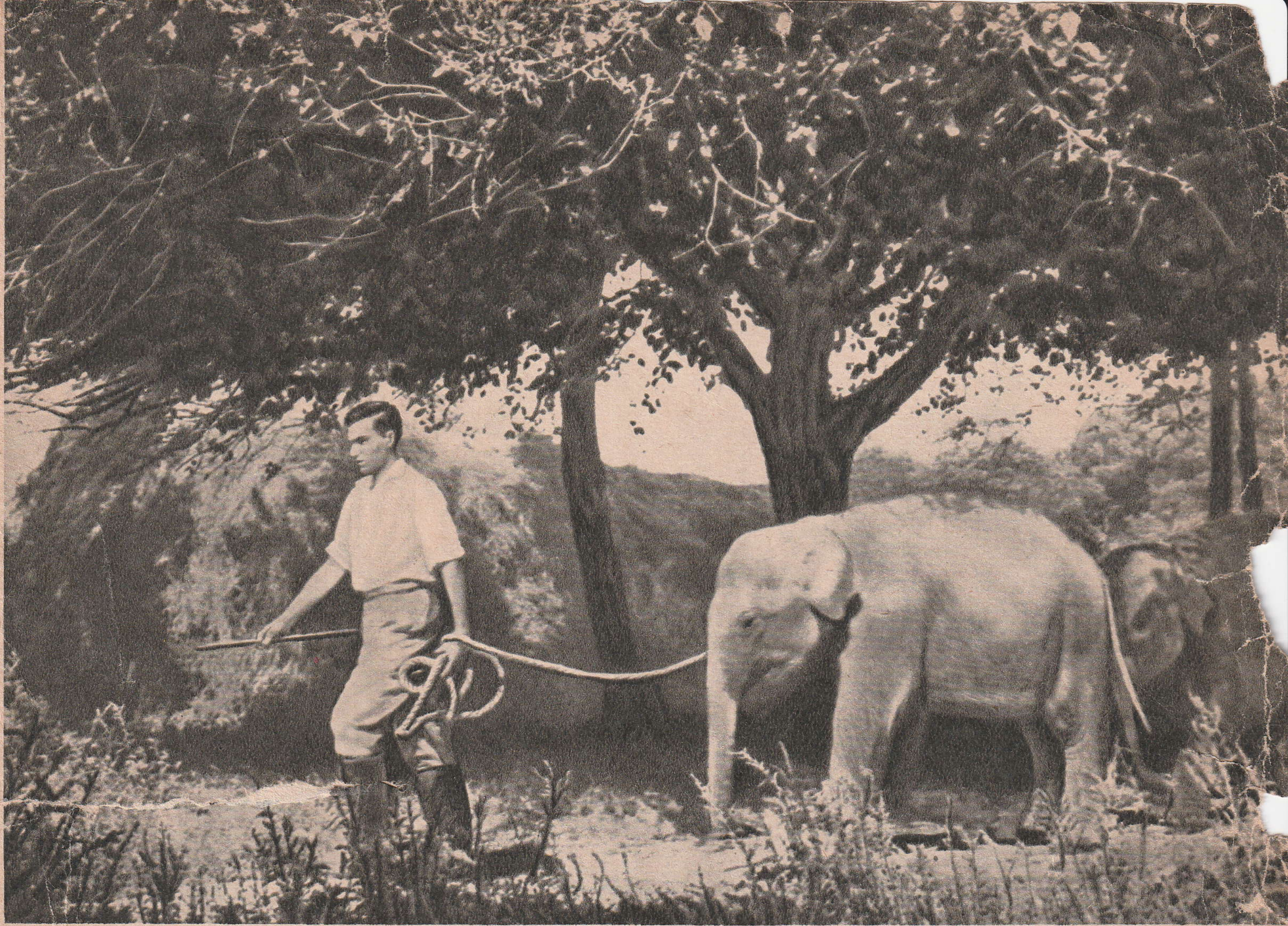
তখন জলের তোড় ছাড়া হল সোজা হাতীদের দিকে।

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে, চেঁচামেচি ঠেলাঠেলি করে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল রবি শশী, পিছনের থাবার উপর ভর দিয়ে দাঁড়াল, ঝাঁকানি দিয়ে তাদের পিঠগুলিকে পেতে দিল জলের তোড়ের নিচে।

হাসিমুখে ডিরেক্টর বললেন, 'ভাল জিনিষের বেশি ভাল নয়, এখন থেকে রোজই তোমাদের স্নান হবে!'

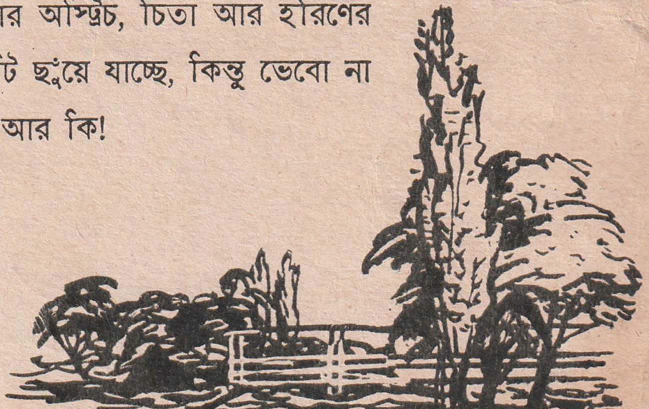


স্নান করে বাচ্চা হাতীদের যত খুসী খারিতোন খারিতোনভিচের খুসীও তার চাইতে কম নয়। বুঝলেন, নতুন পরিবেশে রবি শশী একটু একটু করে অভ্যস্ত হয়ে আসছে।



রবি শশী যায় বেড়ু করতে

রোজ সকালে দর্শকেরা চিড়িয়াখানায় আসবার আগেই রবি শশী যায় বেড়াতে। রবির গলায় দড়ি দিয়ে হাতীশাল থেকে বাইরে নিয়ে গেলে বিশেষ আমন্ত্রণের জন্য শশী বসে থাকত না: নিজেই রবির পিছন পিছন চলে আসত। একজন সামনে একজন পিছনে এপাশ ওপাশ একটু দুলতে দুলতে বাচ্চা হাতীরা হেঁটে যেত চিড়িয়াখানার বড় রাস্তা ধরে। পার হয়ে যেত ঈগল আর শেয়াল, সিংহ আর অস্ট্রিচ, চিতা আর হরিণের খাঁচাগুলি। রবি শশীর মাথা সামান্য নিচু, শুঁড়গুলি মাটি ছুঁয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ভেবো না ওদের দুঃখ হয়েছে। একটু চাল দেখাচ্ছে রবি শশী, এই আর কি!



চিড়িয়াখানার উল্টো দিকের শেষে ছোট একটা খোলা জায়গা, ছোট ঝোপঝাড় আর নিচু ঘন ঘাসে ঢাকা। ওরা থামল এখানে। দড়ি খুলে নেওয়া হল রবির, ঘাসের মধ্যে চড়তে লাগল বাচ্চা হাতীরা।

রবি এখনো ঘাস ছিঁড়তে পারে না, সবে শিখছে সে। বেশি করে ঘাস ধরতে চায় ও, কিন্তু শুঁড় কথা শোনে না। বাচ্চা তো, এখনো অতোটা জোর হয়নি। তবু মাঝে মাঝে এক একবার রবি নিজেই এক গোছা মিষ্টি ঘাস ছিঁড়তে পারছে। আর মহাখুসী হয়ে বাচ্চাটা অনেকক্ষণ ধরে ভালো করে ঝেঁকে ঝেঁকে সব মাটি ঝেড়ে ফেলে, তারপর মুখে পুরে দেয়।

শশী আলসে, ঘাস ছিঁড়বার চেষ্টাও করে না। অন্যেরা গোছা গোছা ঘাস তার শুঁড়ে তুলে দেয়।

শশীকে শেখাবার জন্য রবি ওর শুঁড় থেকে ঘাসের গোছাটা কেড়ে নিয়ে একপাশে ছুঁড়ে দিল।

'শেখা দরকার শশী, দেখো আমি কেমন করে করি!' যেন বলে রবি, তারপর আবার এক গোছা ঘাস ধরে মাটি থেকে সেটা ছিঁড়তে চেষ্টা করে।

ফেরার পথেও ওদের ঠিক সেই আগের মতোই চালচলন: আগে আগে চলেছে দড়ি-বাঁধা রবি, আর পিছনে পিছনে স্বাধীনভাবে শশী।

পথের মাঝামাঝি জলের পিপার কাছে আবার থামে ওরা। পিপাটা উঁচু, বাচ্চা হাতীরা দেখতে পায় না ভিতরে কী আছে। রবি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শুঁড় তুলে ভিতরে জলের মধ্যে নামিয়ে দেয়। এক মিনিটের মধ্যেই সে শুঁড় ওর মুখে—জল খাচ্ছে সে।

শশী কিন্তু বুঝতে পারে না, কি করছে রবি। নজর করে করে দেখে কিন্তু পিপার কাছে আসতে চায় না।

অগত্যা ওকে একটু সাহায্য করতে হয়। ওকে নিয়ে আসা হয় পিপার কাছে, শুঁড়টি ধরে ডুবিয়ে দেওয়া হয় জলের মধ্যে। শশী কিন্তু আবার গোঁ ধরে — সরিয়ে নেয় শুঁড়। তখন চিড়িয়াখানার কর্মীরা কয়েক আঁজলা জল ছিটিয়ে দেয় তার গায়ে।

'দেখ শশী, এ জল, জল! তুমি ত চান করতে ভালবাস, আর জল খেতেও ভালবাস! নাও খাও!'



শশী কিন্তু মাথা নাড়ে, ঝাঁকানি দিয়ে জল ফেলে দেয়, খেতে চায় না।



তখন নিয়ে আসা হল একটা জগ। জল ভর্তি করে সেটা শশীর সামনে নামিয়ে রাখা হল। জল দেখেই তখন আগ্রহের সঙ্গে জগের মধ্যে শুঁড় ডুবায় শশী, খেতে শুরু করে।

রবি দাঁড়িয়েছিল পিপার কাছে, জগ থেকে শশী জল খাচ্ছে দেখে অমনি সে ঘুরে সেটার দিকে শুঁড় বাড়াল। রেগে গিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল: শশীর বেলায় কেন এমন সুন্দর ঝকঝকে জগ, আর তাকে কিনা জল খেতে হল একটা সাধারণ পিপা থেকে? কী অবিচার!

কিন্তু শশী রাগ করল না রবির উপর, জগের মধ্যে শুঁড় ঢোকাতে বাধাও দিল না: খেতে দাও ওকে। বন্ধুকে অদেয় কিছুই নাই!

প্রতিবেশীর মেজাজ বদলায়

বেড়ান শেষ হয় রবি শশীর—সময় হয়েছে ফেরবার। আবার তারা আসে বড় রাস্তায়, চলতে আরম্ভ করল হাতীশালের দিকে। কিন্তু দু'পা যেতে না যেতেই ওরা শুনল কে ডাকছে।

চিড়িয়াখানায় প্রায়ই নানা ধরনের পশুপাখি ডাকে, বাচ্চা হাতী দুটির তা সয়ে গেছে। এমন কি যখন সিংহ হুঙ্কার দেয় নিজের খাঁচায় আর পাশের খাঁচায় তিনটে বাচ্চার চৌকি দিতে দিতে গর্জন করে উঠে সিংহী, তখনো রবি শশী কিছুমাত্র মন দেয় না সেদিকে।

আজকের এই ডাকটা কিন্তু তাদের কাছে খুব আপন মনে হল।

'দিল্লী ডাকল না তো?'

রবি শশী তাড়াতাড়ি পা চালায় হাতীশালের দিকে। দিল্লী দেখল রবি শশী ফিরে আসছে নিরাপদে সুস্থ শরীরে, ডাক থামিয়ে সানন্দে শুঁড় দোলাতে লাগল সে:



'তাড়াতাড়ি এস, তোমাদের না দেখে ভালো লাগছিল না!'

নিজেদের বেষ্টনীর ভিতরে ঢুকেই ওরা সঙ্গে সঙ্গে ফিরল দিল্লীর দিকে।

'খুব বেশি কাছে আসতে দেওয়া বোধ হয় ঠিক নয়? দিল্লী যদি গুঁতো দেয়!' উদ্বিগ্ন হয় উঠলেন খারিতোন খারিতোনভিচ।

কিন্তু যা হল তা একেবারেই বিপরীত, মিছেই ভাবনা হয়েছিল ডিরেক্টরের।

শুঁড় দিয়ে দিল্লী আদর করতে শুরু করেছে বাচ্চাদের, ছোট ছোট কালো সদয় চোখ দুটো তার চকচক করে উঠেছে স্নেহে আর সুখে। নতুন প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রথম সেই অপয়া সাক্ষাৎকারের কথা কখন ভুলে গেছে রবি শশী, হস্তিনীর গোদা গোদা বড়ো বড়ো পায়ে তারা গা ঘষতে শুরু করেছে নিশ্চিন্তে।

চিড়িয়াখানায় সাক্ষাৎ

আগে কখনো চিড়িয়াখানার প্রবেশপথে কিউ হত না, আজকাল হচ্ছে। তাতে আবার আজ রবিবার, লোকের ভিড় বিশেষ করে বেশি।

'আমাদের কিন্তু কিউ-এ দাঁড়াতে হবে। কি রকম মনে হচ্ছে?' ক্যাপ্টেন চেরনব্রোভকিন জিজ্ঞাসা করলেন ছেলেকে।

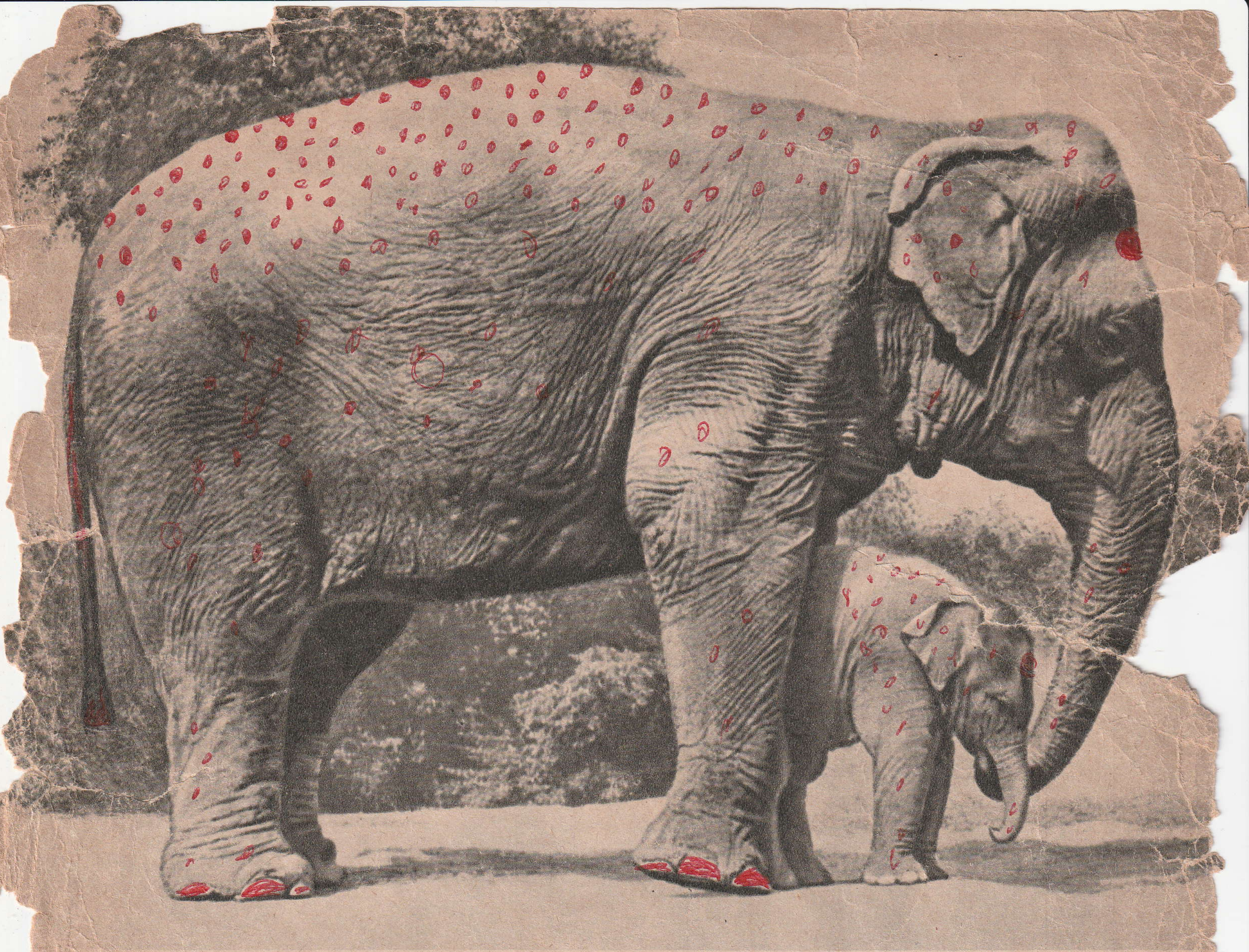
'তাই দাঁড়াব!'

ভভা চেরনব্রোভকিনের বয়স মাত্র পাঁচ বছর, কিন্তু সারাদিন ধরেই সে কিউ-তে দাঁড়িয়ে থাকবে: যাই হোক না কেন, যেমন করেই হোক দেখতেই হবে রবি আর শশীকে। বন্দরে যখন বাবার জাহাজ দেখতে গিয়েছিল ভভা তখন বড় হাতীদের দেখেছিল কিন্তু বাচ্চা হাতীদের ভালো করে দেখতে পায়নি— খাঁচার ভিতরে তাদের দেখা যাচ্ছিল না।

সারাদিন ধরে অবিশ্যি কিউ-এ দাঁড়াতে হল না। ক্যাপ্টেন চেরনব্রোভকিন ও তাঁর ছেলে কিছুক্ষণ পরেই দেখতে পেল রবি শশী খেলা করছে, টানাটানি করছে খড় নিয়ে।

প্রচুর লোকের ভিড় জমে গেল বেষ্টনীর চারদিকে। এই ভিড়ের মধ্যে কারা বেশি —





বয়স্করা না শিশুরা তা কিন্তু বলা মুশকিল। যেমন ছোটোরা তেমনি বড়োরা সকলেই দেখতে চায় রবি শশীকে।

ভভা চেরনব্রোভকিন বাবার কাঁধে নেচে উঠে জিজ্ঞেস করল। 'ওদের মধ্যে কোনটি কে?'

বাবা বুঝিয়ে দিলেন, 'ডান দিকের বাচ্চাটির নাম রবি আর বাঁ দিকেরটি শশী।'

ক্যাপ্টেনের পাশে দাঁড়িয়েছিল তাঁর জাহাজের বন্ধুরা—ইলেকট্রিশিয়ান সকলোভ আর জাহাজী কলমিয়েৎস, সারেঙ্গ সাভসকিন আর মেকানিক শ্লীকভ। রবি শশীকে



দেখে 'স্তাভরপলের' জাহাজীরা ছাড়া কারা আর অতো খুসী হবে। আগে থেকে কোন ঠিকঠিকানা না করে আজই তারা চিড়িয়াখানায় এসেছে তাদের পূর্বতন যাত্রীরা কেমন আছে তাই দেখতে।

'আর ওরা কেন তোমাদের দিকে তাকাচ্ছে না?' আগ্রহের সঙ্গে আবার জিজ্ঞাসা করল ভভা।

'বোধ হয় ভুলে গেছে,' উত্তর দিলেন চেরনব্রোভকিন।

'ওরা এখনো বাচ্চা, আর লোকও এখানে মেলা। আমাদের খুঁজে পাচ্ছে না।' যোগ করল সকলোভ, যেন ও সমর্থন করতে চাইছে রবি শশীকে।

হঠাৎ এক অবাক কান্ড ঘটল।

রবি শশী বেড়ার দিকে ফিরে শুঁড় দোলাতে লাগল।

'দেখুন! দেখুন! চিনতে পেরেছে!' অবাক হয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল সকলোভ।

জাহাজীদের খুসী আর ধরে না। চারপাশে যারা দাঁড়িয়েছিল তারাও সবাই খুসী। আর ভারতীয় শিশু হাতী রবি আর শশী আনন্দে শুঁড় দোলাতে লাগল, অভিনন্দন জানাল তাদের নতুন পুরনো রুশী বন্ধুদের।

